গল্প বিচিত্রা



গল্প বিচিত্রা

সম্পাদনা

সন্তোষ সেন

বিজয় বুক ষ্টল

৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রকাশক : বিজয়কৃষ্ণ দাস ৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৭। মুদ্রক : শিবশংকর প্রেস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : দশ টাকা

বেদের গল্প

ব্রহ্মবিদ মৈত্রেয়ী

বৈদিক যুগের অনন্যসাধারণ বিদুষী মহিলা মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী।

তিনি ছিলেন তত্ত্ববিদ পরমযোগিনী। সংসারের সাধারণ সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা তাঁর অন্তরের শান্তিকে কোন দিন বিঘ্নিত করতে পারেনি।

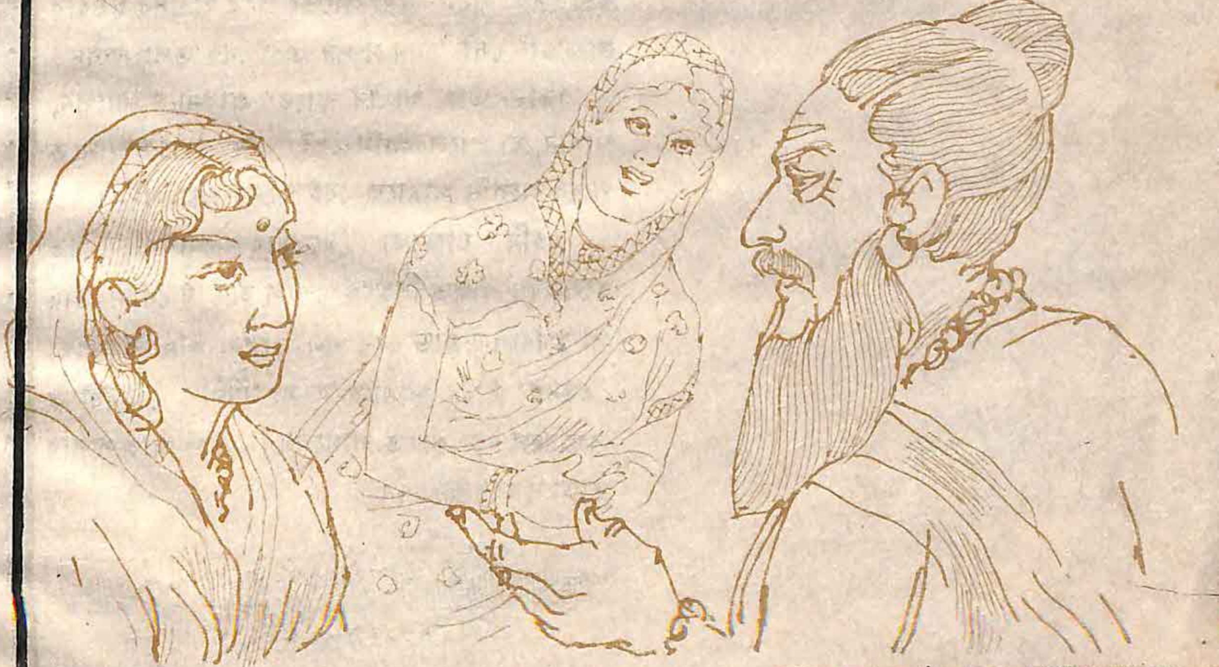
একদিন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণীকে ডেকে বললেন, তোমাদের দুজনের প্রতি আমার সমান দৃষ্টি। আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমাদের দুজনকে ভাগ করে দিতে চাই।

কাত্যায়ণী সম্পত্তি ভাগের কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি সংসারের সেরা জিনিসগুলি দাবী করে বসলেন।

মৈত্রেয়ী বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে বরাবরই উদাসীন। স্বামীর পায়ের কাছে বসে ভগবানের মহিমা কীর্তন শোনা ছাড়া কোন জিনিসের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি সম্পত্তি ভাগের কথা শুনে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, সংসারের এই সব জিনিসপত্র কি মানুষকে স্থায়ী সুখ বা আনন্দ দিতে পারে?

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা পারে না। বরং এই সব জিনিস শেষ পর্যন্ত অনন্ত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সবকিছুরই মৃত্যু বা ধ্বংস আছে। আর প্রিয় জিনিস নষ্ট হলেই মন ব্যথায় কাতর হয়ে ওঠে।

মৈত্রেয়ী আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি যদি আমাকে আপনার সমস্ত ধন দৌলত দেন—তাহলে তার বিনিময়ে কি আমি ঈশ্বরকে পাব?





যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, পাবে না। তবে তুমি এই পৃথিবীতে ধনীর মর্যাদা পাবে। তোমার খ্যাতি আর প্রতিপত্তি বাড়বে।

মৈত্রেয়ী বললেন, সে সুখ কি আমার চিরকাল থাকবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা থাকবে না। কারণ, তুমিও তো মৃত্যুর অধীন, একদিন এর শেষ আছে। সেই মৃত্যুর সাথে পার্থিব জগতের এই সুখ ভোগও শেষ হবে।

মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামীর কাছে এই উপদেশ লাভ করে বুঝতে পারলেন আগুনে ঘি পড়লে সে আগুন কখনও নেভে না। বরং তার লেলিহান শিখা ক্রমে বেড়েই চলে। তেমনি বিষয়মুখী মনও বিষয়ের আস্বাদ পেলে বিষয়-তৃষ্ণা বেড়েই যায়। কাজেই, সম্পদ পরম পথের সম্বল হতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্যই পরমার্থ পথের সম্বল। মোহ জাল ছিন্ন করে সেই পরম সত্য লাভের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে চাই সেই জ্ঞান সম্পদ এবং সেই তপঃ সম্পদ।

তিনি তাঁর স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালেন, স্বামীন, যা পেলে আমি সেই পরম সত্যকে জানতে পারব আপনি আমাকে সেই পথের সন্ধান দিন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর প্রার্থনায় প্রীত হলেন। প্রকৃত শিষ্যকে পেলে আচার্য যেমন তাঁর সমস্ত বিদ্যা উজাড় করে দান করেন, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তেমনই তাঁর জ্ঞানান্বেষী সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে লাগলেন। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হলো না।

উপনিষদের গল্প

দমন দান দয়া

প্রজাপতির মহাপাঠশালা। সেখানে পড়তে এসেছে স্বর্গ থেকে দেবতারা, মর্ত্য থেকে মানুষরা আর পাতাল থেকে অসুররা।

গুরুদেব সকলকে সমান সন্তানস্নেহে পালন করছেন। পড়াশোনা শেখাচ্ছেন।

একদিন দেবতারা ভাবলেন যে তাঁদের জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁরা সকলে মিলে হাজির হলেন গুরুদেবের কাছে।

তারপর বললেন, ভগবান! আমরা আজ আমাদের বিদ্যালাভের শেষ পরীক্ষা দেব বলে আপনার কাছে এসেছি।

গুরুদেব সকলের দিকে হেসে তাকালেন। তারপর আঙুল তুলে কেবল 'দ' এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে থেমে গেলেন।

দেবতারা একটু চিন্তা করে বলে উঠলেন, পেরেছি পেরেছি, আমরা বুঝতে পেরেছি গুরুদেব, 'দ' বর্ণের অর্থ দমন করা। আপনি আমাদের বলছেন রাগ, লোভ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—এই সব রিপু দমন কর। এগুলি অতি মন্দ অভ্যাস। এগুলি ত্যাগ না করলে দেবতা হওয়া যায় না।

ছাত্রদের উত্তর শুনে গুরুদেব প্রজাপতি খুশি হয়ে বললেন, ঠিক বলেছ। তোমাদের বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি আশীর্বাদ করি তোমরা দমন গুণ অভ্যাসে জয়লাভ কর। যাও, তোমরা স্বর্গে ফিরে যাও।

তারপর এলেন মানুষরা। মানুষের কাছেও প্রজাপতি সেই একটি মাত্র 'দ' বর্ণ উচ্চারণ করে



থেমে গেলেন।

একটু চিন্তা করে মানুষ ছাত্ররা বলে উঠল, বুঝেছি, বুঝেছি। গুরুদেব আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনি বলেছেন। 'দ' বর্ণের অর্থ, দান কর। আমরা বড় লোভী। পরের জিনিস কেড়ে-কুড়ে নেওয়াই আমাদের অভ্যাস। আর সেই জন্যই পৃথিবীতে যত অশান্তি। মানুষ দাতা হলেই পৃথিবী থেকে হিংসা মারামারি চলে যাবে। তাই আপনি আমাদের দাতা হতে বলেছেন।

প্রজাপতি মানুষের উত্তর শুনে আনন্দে বললেন, বাঃ বাঃ! ঠিক বুঝেছ বাবা, ঠিক বুঝেছ। যাও, পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা দাতা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকো।

এবার এলো অসুররা। তারাও গুরুদেবকে প্রণাম করে উপদেশ প্রার্থনা করল। গুরুদেব তাদেরও সেই 'দ' বর্ণটি উপদেশ দিলেন।





অসুররাও একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝেছি গুরুদেব। আমরা বুঝতে পেরেছি। 'দ' অর্থ দয়া কর। আপনি আমাদের দয়ালু হতে বলছেন। আমরা অসুর। আমাদের মন বড় কঠিন। দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। তাই মারামারি, ঝগড়াঝাটি নিয়েই আমাদের দিন কাটে। দয়ালু হলে মনের নিষ্ঠুরতা চলে যায়। তাই আপনি আমাদের দয়ালু হতে বলছেন।

প্রজাপতি বললেন, হ্যাঁ বাবা। দয়ার মত গুণ নেই। তোমরা ঠিক বুঝতে পেরেছ। আমার আদেশ মত চললে তোমরা শান্তি পাবে। সুখে বাঁচতে পারবে। আকাশের দিকে কান রেখো—মেঘ ডাকলেই শুনতে পাবে বজ্রস্বরে আমার উপদেশ ধ্বনিত হচ্ছে—দ, দ, দ। যাও, তোমরা দেশে ফিরে যাও।

পুরাণের গল্প

দানের মহিমা

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরা জয়লাভ করলেন। পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে ঠিক করলেন এই উপলক্ষে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করবেন।

দেশে দেশে যেখানে যত রাজা ছিল সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। নির্দিষ্ট দিনে রাজারা তাদের সাধ্যমত জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হলেন রাজ-বাড়িতে। তাছাড়া এলেন বড় বড় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সাধু এবং অজস্র সন্ন্যাসী।

সে এক এলাহি ব্যাপার। সেই যজ্ঞের যেমন বিরাট আয়োজন, তেমনই তার বিপুল খরচ। ক'দিন ধরে সারা রাজ্যে খাওয়া-দাওয়া দান-ধ্যানের স্রোত বয়ে গেল।

যজ্ঞ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকলেই পাণ্ডবদের প্রশংসা করতে লাগল। বলতে লাগল, আহা, এমন যজ্ঞ আমরা কখনও কোথাও দেখিনি, জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

হঠাৎ সেই যজ্ঞস্থলে একটা বেজি এসে উপস্থিত হলো। অদ্ভুত চেহারার সেই বেজিটার অর্ধেকটা সোনালী আর বাকি অংশটা সাধারণত যেমন হয়, তেমন মেটে রঙের।

সভার মাঝে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলল, আরে দুর! দুর! এটা আবার একটা যজ্ঞ হয়েছে নাকি! এটা যজ্ঞই হয়নি।

বেজির কথা শুনে সবাই তেড়ে মারতে এলো বেজিকে। বলল, যজ্ঞ হয়নি বলছ কি গো? এত বিরাট আয়োজন। এত দান-ধ্যান। হৈ হুল্লোড়। এর চেয়ে আবার বড় যজ্ঞ হয় নাকি?

বেজি বলল, হয়। আমি নিজের চোখেই সেই যজ্ঞ দেখেছি। তাহলে শোন। বলে বেজি বলতে শুরু করল—





এক গ্রামে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করত। সংসারে তারা ছিল চারজন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ছেলে আর ছেলের বউ। বলতে গেলে ভিক্ষা করেই তাদের দিন কাটতো। কিন্তু গরীব হলে কি হয় তাদের মন ছিল ফুলের মতো পবিত্র। তারা ভগবানে বিশ্বাস তো করতোই তার ওপর সবাইকে নিজের মতো দেখতো বলে, কারও ওপর তাদের হিংসা বা ঘৃণা ছিল না।

একবার পর পর চারদিন তারা কোন ভিক্ষাই পেল না। ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের শরীর একেবারে নেতিয়ে পড়ল। চার দিনের দিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে সামান্য কিছুটা যবের ছাতু জোগাড় করে আনল।

ছাতুটুকু দেখে সকলের মুখে হাসি ফুটল। তারা ঠিক করল, ভগবান আজ যেটুকু জুটিয়েছেন সেইটুকুই আমরা সন্তুষ্ট মনে ভাগ করে খাব।

স্নান সেরে দেবতার পূজা করে তারা সকলে খেতে বসল। ছাতুটুকু চার ভাগে ভাগ করে তারা সবে খেতে বসেছে এমন সময় দরজায় এক অতিথি এসে হাজির।

দুপুরবেলার অতিথিকে তো আর অভুক্ত রাখা যায় না তাই ব্রাহ্মণ তার নিজের ভাগটুকু অতিথিকে তুলে দিল।

অতিথি ছাতুটুকু খেয়ে বলল, আমার মোটেই পেট ভরেনি।

ব্রাহ্মণী বলল, তাহলে আপনি আমার ভাগের-টুকুও খান।



তাতেও অতিথির পেট ভরল না। সে বলল, না, আমার পেটের এক কোণও ভরতি হয়নি।

অতিথির কথা শুনে ছেলে তার ভাগের টুকুও অতিথিকে খাওয়াল। তাতেও অতিথি তার আসন ছেড়ে ওঠে না। তাই দেখে ছেলের বউ তার ভাগের ছাতুটুকুও নিয়ে এসে অতিথির পাতে ঢেলে দিল।

এতক্ষণে অতিথি পরিতৃপ্ত হলো। খাওয়া শেষ করে আশীর্বাদ করে বলল, তোমরা সবাই আজ আমাকে খাইয়ে যে পুণ্য লাভ করলে—তাতে তোমরা অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।

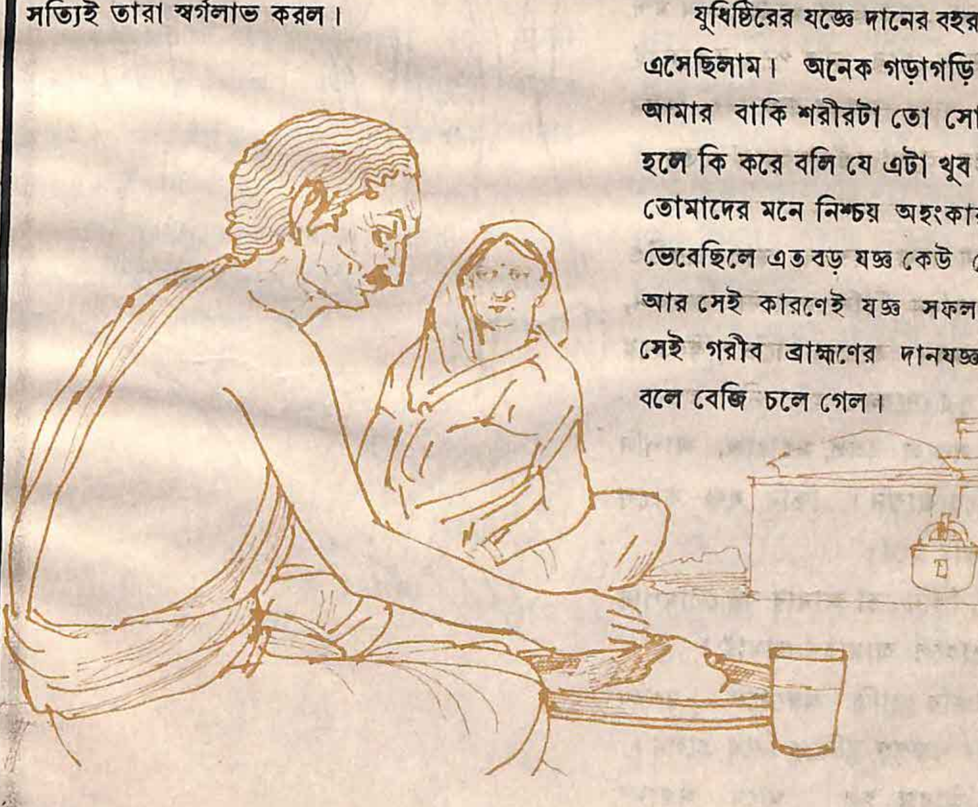
পর পর কয়েকদিন অনাহারে থাকার ফলে সেদিনই ব্রাহ্মণ সপরিবারে মারা গেল। আর, সত্যি সত্যিই তারা স্বর্গলাভ করল।

বেজির গল্প শুনে সবাই আঁতকে উঠে বলল হায় হায়, সে কি!

বেজি বলল, হ্যাঁ, এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভগবান নিজেই সেদিন ওদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

ব্রাহ্মণের এই ত্যাগ দেখে আমি দৌড়ে গেলাম তার সামনে আর 'ধন্য তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি ধন্য' বলে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম ধুলোয়। চেয়ে দেখি আমার দিকে, সেই পবিত্র ধুলোয় আমার শরীরের অর্ধেক সোনা হয়ে গেছে। এরপর যেখানে যত যজ্ঞ আর দানের নাম শুনেছি সেখানে ছুটে গিয়ে গড়াগড়ি দিয়েছি। কিন্তু বাকি দেহটা কিছুতেই আর সোনা হচ্ছে না।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দানের বহর শুনে তাই তো ছুটে এসেছিলাম। অনেক গড়াগড়ি খেলাম। কিন্তু কৈ, আমার বাকি শরীরটা তো সোনা হলো না। তা হলে কি করে বলি যে এটা খুব ভালো যজ্ঞ হয়েছে। তোমাদের মনে নিশ্চয় অহংকার হয়েছিল। তোমরা ভেবেছিলে এত বড় যজ্ঞ কেউ কোন কালে করেনি। আর সেই কারণেই যজ্ঞ সফল হয়নি। এর চেয়ে সেই গরীব ব্রাহ্মণের দানযজ্ঞ অনেক বড় ছিল। বলে বেজি চলে গেল।



রামায়ণের গল্প

রাজা দশরথ



অনেক দিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন।

তখনকার অযোধ্যা দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

সুন্দর অযোধ্যা নগরে শাদা পাথরের বিশাল রাজপুরীতে শাদা ছাতার নিচে বসে রাজা দশরথ তার রাজ্যের কাজ দেখতেন। তার এমন আটজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর ধার্মিক মন্ত্রী ছিল যে, দেশে চোর ডাকাত ছিল না, কেউ ভাল ছাড়া কোন মন্দ কাজ করত না। ভাল খেয়ে, ভাল পরে, সকলেরই সুখে দিন কাটত। রাজা দশরথ প্রজাদের যেমন গভীর ভালোবাসতেন প্রজারাও দশরথকে তেমনই গভীর ভালোবাসত।

হায়! এমন যে রাজা দশরথ, তার একটিও ছেলে ছিল না। একদিন তিনি মন্ত্রীদের বললেন, দেখ, আমি যজ্ঞ করব। হয়তো তাতে খুশি হয়ে দেবতারা আমাকে পুত্র দেবেন।

এ কথা শুনে সকলে বলল, মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে আসুন। তিনি যজ্ঞ করলে নিশ্চয় আপনার সন্তান হবে।

দশরথ বললেন, তিনি তো আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার জামাই—তাহলে আমারও জামাই।

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে এলেন।

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হল। আগে অশ্বমেধ

যজ্ঞ। প্রথমে একটা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। ঘোড়ার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেক সৈন্য সামন্ত চলল, যাতে কেউ তাকে আটকাতে না পারে। তারা ঘোড়াটাকে ক্রমাগত এক বৎসর নানা দেশ ঘুরিয়ে শেষে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনল।

তত দিনে শয়ে শয়ে কারিগর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মজুর মিলে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞের জন্য চমৎকার জায়গা তৈরি করেছে। সেখানে কত যে মুনি, ব্রাহ্মণ, রাজা আর অন্যান্যরা এসেছেন তার সীমা সংখ্যা নেই।

ঘোড়া ফিরে এলে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বললেন, এইবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে মহারাজের ছেলে হবে।

তখনই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হল। সেই যজ্ঞের আগুনের ভিতর থেকে একজন দিব্যপুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে রুপোর ঢাকা দেওয়া সোনার থালায় চমৎকার পায়েস।

সেই দিব্যপুরুষ দশরথকে বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মা নিজেই এই পায়েস তৈরি করে পাঠিয়েছেন। এই পায়েস রাণীদের খেতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হবে। এই বলে তিনি কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন কেউ দেখতে পেল না।

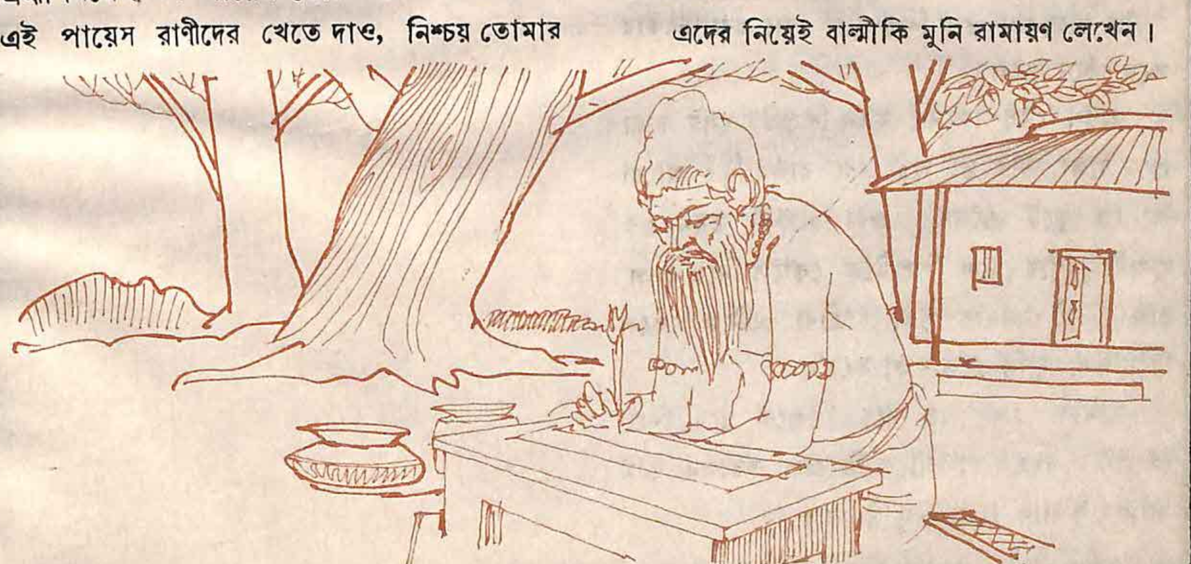
দশরথের মনে তখন আনন্দ আর ধরে না। এই পায়েস রানীদের খেতে দিলেই তার পুত্র হবে! তার প্রধান রানী তিনজন—বড় কৌশল্যা, মেজ কৈকেয়ী, ছোট সুমিত্রা। রাজা সেই পায়েস নিয়ে গিয়ে তাদের খেতে দিলেন।

তখন তিন রানীতে মিলে মনের সুখে সেই পায়েস খেলেন। তার কিছুদিন পরেই তাদের দেবতার মতন চারটি ছেলে হল—কৌশল্যার একটি, কৈকেয়ীর একটি আর সুমিত্রার দুটি।

সকলের বড় ছেলেটি কৌশল্যার, তার নাম হল রাম। তার পরেরটি কৈকেয়ীর, তার নাম হল ভরত। আর দুটি সুমিত্রার, তাদের নাম হল লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

অল্পদিনের ভিতরেই তারা সকলে যারপরনাই বিদ্বান আর বীর হয়ে উঠল। লেখায়, পড়ায়, যুদ্ধে, শিকারে কোন কাজেই তাদের মতন আর কেউ ছিল না।

এদের নিয়েই বাল্মীকি মুনি রামায়ণ লেখেন।



মহাভারতের গল্প

বীর জরাসন্ধ

মগধদেশের পরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রথ কাশী-রাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে চণ্ডকৌশিক মুনি তাঁকে একটি পাকা আম দিলে তিনি তাঁর দুই পত্নীকে সেটি ভাগ করে খেতে দেন।

মুনির মন্ত্রবলে দুই পত্নীর গর্ভে এক চোখ, এক হাত, এক পা-ওয়ালা একটি করে অর্ধমানবশিশু জন্মগ্রহণ করল। দুই রানী সেই অপূর্ণ মাংসখণ্ড দেখে ঘৃণাভরে ধাত্রীদের ফেলে দিতে বললেন। ধাত্রীরা ওই দুটি টুকরো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলো। জরা নামে এক রাক্ষসী পথের পাশে পড়ে থাকা সেই দু'টুকরো মাংস কুড়িয়ে নিয়ে জোড়বার চেষ্টা করতেই দুটি টুকরো এক হয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবান এক শিশু হয়ে গেল এবং চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

প্রবল মেঘ-গর্জনের মতন শিশুটির সেই কান্না শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্নী এবং রাজবাড়ির আরো অনেকে ছুটে এলেন। জরা রাক্ষসী তখন এক সুন্দরী রমণীর বেশে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বলল, রাজা, এটি তোমার পুত্র, ধাত্রীরা এটিকে ফেলে দিয়েছিল, আমি একে রক্ষা করেছি।

রানীরা তখন বহু যত্নে শিশুকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বৃহদ্রথ রাক্ষসীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কল্যাণ করেছ—তুমি কে?

সে বলল, আমি জরা রাক্ষসী, তোমার প্রাসাদে ব্রহ্মার ইচ্ছায় আমি দানব বিনাশের জন্যে বাস করি। আমরা হলাম গৃহস্থের রাক্ষসী। ঘরের দেয়ালে গৃহদেবীকে চিত্রিত রাখলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। আমি তোমার গৃহ-প্রাচীরে চিত্রিত থেকে সুখে বাস করছি। তোমার কল্যাণ হোক। এই বলে সে অন্তর্হিত হলো।

জরা রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড মাংসপিণ্ড জুড়ে দিয়েছিল বলে সেই কুমারের নাম হলো জরাসন্ধ।



জরাসন্ধ বড় হলে বৃহদ্রথ তাঁকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে দুই পত্নীর সঙ্গে তপোবনে চলে যান। চণ্ডকৌশিক মুনির আশীর্বাদে জরাসন্ধ প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাজা হন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রবল শত্রুতা হয়।

জরাসন্ধকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভীম আর অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গণ্ডকী, মহাশোন প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় যান। তারপর সেখান থেকে গঙ্গা ও শোননদী পার হয়ে মগধরাজ্যে প্রবেশ করেন।



কিন্তু জরাসন্ধকে হাতাহাতি যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনভাবে হত্যা করা সম্ভব নয়; এবং সেক্ষেত্রে নির্জন স্থানে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তার সঙ্গীরা যেন ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারী হয়ে ঘরে ফিরছেন সেই রকম স্নাতকের বেশে জরাসন্ধের প্রাসাদে এসে বললেন, রাজা, আপনার মঙ্গল হোক।

জরাসন্ধ তখন ব্রত পালন করছিলেন। তিনি তাঁদের যোগ্য সমাদরে বরণ করলেন, কিন্তু তাঁর মনের সন্দেহের কথাও জানালেন। তিনি বললেন, আপনারা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মতো সেজে এলেও আপনাদের গায়ে ক্ষত্রিয়ের মতো আঘাতচিহ্ন কেন? তাছাড়া সামনের রাস্তা দিয়ে না এসে আপনারা পিছনের পথ দিয়েই বা এসেছেন কেন?

কৃষ্ণ বললেন, আমরা তোমার শত্রু, তুমি বলি দেবার জন্যে অনেক ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে রেখেছ। তুমি মহাদেবের কাছে পশু-বলির মতন ক্ষত্রিয় বলি দেবার সংকল্প করেছ কেন? আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করি। বল, তুমি আমাদের মধ্যে কার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রস্তুত?

জরাসন্ধ ভীমকে বেছে নিলেন।

দিনের পর দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ভীম কিছুতেই জরাসন্ধকে কাবু করতে পারেন না। শেষে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধর জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করে ভীমকে ইশারায় তার দেহ জোড়ের কথা বলে ওখানেই আক্রমণ করতে বললেন। তখন ভীম তাকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে একশ বার ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর দুই পা ধরে টেনে ছিঁড়ে—সেই জোড়ের জায়গাতেই তাকে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করলেন।

বাইবেলের গল্প

অপব্যয়ী পুত্র



এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দুটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে বড়টি ছিল বাবার অত্যন্ত বাধ্য। সকল বিষয়ে বাবার ইচ্ছা ও মতামত ছাড়া সে এক পা-ও চলত না।

কিন্তু ছোট ছেলেটি মোটেই ভালো ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সে অসৎ সংসর্গে পড়ে সব রকম অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মিথ্যা বলা, চুরি করা, গুরুজনের উপদেশ না শুনে নিজের ইচ্ছায় চলা, মারামারি, কুবাক্য প্রয়োগ—কোন কিছুই বাকি ছিল না।

একদিন ছোট ছেলেটি এসে বাবাকে বলল, বাবা, আপনাদের সঙ্গে প্রতিটি বিষয় ঝগড়া করে এখানে থাকা আমার আর পোষাচ্ছে না। আমি তো আপনার ছেলে—আপনার সম্পত্তির ওপর আমার যেটুকু অধিকার আছে সেই সম্পত্তি আমাকে ভাগ করে দিন—আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করব।

গৃহস্থ কোন রকম আপত্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলের অংশ ছোট ছেলেকে বুঝিয়ে দিলেন। ছোট ছেলে সেই সম্পত্তি অন্যের কাছে বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেল।

এদেশে ছোট ছেলের যেমন অসৎ বন্ধুর অভাব ছিল না, দূর দেশেও তার সে রকমই কিছু বন্ধু জুটে গেল। সুতরাং সে যা টাকা পয়সা সঙ্গে করে



নিয়ে গিয়েছিল তার শেষ পয়সাটিও উড়ে যেতে বেশী দিন সময় লাগল না।

ছেলেটি একদিন অবাক হয়ে দেখল যে সে একেবারে কর্পদকহীন গরীব হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এতদিন তার যে সব বন্ধু-বান্ধব তারই পয়সায় মজা করেছে সেই তারাও তাকে আর চিনতে পারছে না—সে একা, বিরাট এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু পেটের জ্বালা তো আর বাধা মানে না—তাই দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে তাকে সেই দেশের এক গৃহস্থের কাছে শূকর চরাবার কাজ নিতে হলো। কিন্তু সেখানে তাকে যা খেতে দেওয়া হতো তাতে তার পেট ভরতো না। তাই শূকররা যে শুঁটি খায় বাধ্য হয়ে সেই শুঁটি খেয়েই তাকে পেট ভরাতে হতো।

কিছুদিন এই চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে কাটাবার পর একদিন সে শূকর চরাতে চরাতে ভাবল—আমার বাবার বাড়িতে ঝি চাকরের অভাব নেই। সেই দাস-দাসীরাও আমার চেয়ে অনেক ভালো খায়, অনেক ভালো পরে।

না, এখানে আর নয়—সে ভাবল—আমি আমার বাবার কাছে যাব, গিয়ে বলব, বাবা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার কাছে পাপ করেছি—আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই, আমাকে তুমি তোমার একজন মজুরের মত রাখো, আর তার যা প্রাপ্য তাই আমাকে দিও।

এই ভেবে সে পরদিন তার নিজের দেশে রওনা দিল। সে যখন নিজের গ্রামের কাছে পৌঁছেছে তখন তার বাবা তাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারলেন, আর ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে

ধরে তাকে চুম্বন করলেন।

তখন ছেলেটি বলতে শুরু করল, বাবা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার কাছে—

কিন্তু বাবা তার কোন কথাই কানে তুললেন না, হাঁক-ডাকে চাকরদের হুকুম দিলেন—এখুনি আমার ছেলের জন্যে ভালো কাপড়-জামা-জুতো আনো, ওর আঙুলে আংটি পরিয়ে দাও। আর আমার খোঁয়াড়ে সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট যে ভেড়াটি আছে সেটিকে জবাই করার ব্যবস্থা কর। আমরা আজ আমোদ প্রমোদ করব। কারণ আমার এই ছেলেটি মরে গিয়েছিল, আজ বেঁচে উঠেছে—হারিয়ে গিয়েছিল, আজ ফিরে পেয়েছি।

দাস-দাসীরা হৈ হৈ আনন্দে মেতে উঠল।

এই সময়ে বড় ভাই মাঠে ছিল। মাঠ থেকে ফিরে সারা বাড়ি জুড়ে নাচ গান হৈ চৈ শুনে সে একজন চাকরের কাছে জানতে চাইল, কি ব্যাপার—এত হৈ চৈ কিসের?

চাকরটি বলল, আজ আপনার ছোট ভাই ফিরে এসেছে। তাই আপনার বাবা এই আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে সবচেয়ে নধর ভেড়াটিকে জবাই করবার হুকুম দিয়েছেন।

এই কথা শুনে বড় ভাই বাবার ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আর বাড়িতেই ঢুকল না। সেখানেই গুম হয়ে বসে পড়ল।

ভিতর বাড়িতে এই খবর যেতে গৃহস্থ বেরিয়ে এলেন। তারপর বড় ছেলেকে বললেন, এখানে বসলে কেন, ভিতরে চল।

বড় ভাই বাবার কথার কোন উত্তর দিল না।

তখন গৃহস্থ বললেন, কি ব্যাপার? তোমার এত রাগের কি কারণ ঘটল?



এবার বড় ছেলে চিৎকার করে বলে উঠল, বাবা, আমি এত বছর ধরে আপনার সেবা করছি, আপনার ইচ্ছা এবং অনুমতি ছাড়া একটা কাজও করিনি, তবুও আপনি আমার জন্যে কোন দিন একটি ছাগশিশুও জবাই করেননি—যাতে আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আমোদ প্রমোদ করতে পারি। আর আপনার ছোট ছেলে—যে নাকি আপনার সম্পত্তির শেষ পাইটি বুঝে নিয়ে বিদেশে গিয়ে মদ খেয়ে আর অকাজ কুকাজ করে সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিল—আপনি সেই তারই জন্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় নধর ভেড়াটিকে জবাই করবার হুকুম দিয়েছেন।

গৃহস্থ বললেন, বাবা, রাগ দমন কর। রাগ চণ্ডাল। রাগের বশ হলে রাগ তোমাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করিয়ে নিতে পারে। সুতরাং রাগ সামলাও। শোন, তুমি তো আমার বড় ছেলে, তুমি তো সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছো, আমার যা কিছু আছে সবই তোমার। কিন্তু আজ তো আমাদের আনন্দ করা উচিত—কারণ তোমার ছোট ভাইটির মৃত্যু ঘটেছিল, সে আজ বেঁচে উঠেছে, সে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে আজ ফিরিয়ে পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধুকে তোমার যদি অনেক টাকা থাকে তাহলে কি একটা টাকা হারিয়ে গেলে তুমি সেটার খোঁজ কর না? সিন্ধুকের টাকা নিয়েই খুশি থাকো? তারপর সেই হারানো টাকাটা যখন খুঁজে পাও তখন কি তুমি আনন্দে নেচে ওঠো না?



কথাসরিৎসাগরের গল্প

মূর্খ ভৃত্যদের বুদ্ধি

এক বণিক উটের পিঠে মাল বোঝাই করে ব্যবসা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উটের পিঠে তিনি এত মাল বোঝাই করেছিলেন যে মালের ভারে উটটা আর চলতেই পারছিল না। তাই দেখে তিনি তার ভৃত্যদের বললেন, ওরে, মালের ভারে উটটা আর চলতে পারছে না। আমি আর একটা উট কিনে আনি, তোরা খেয়াল রাখিস—বৃষ্টি এলে প্যাঁটরাগুলির চামড়া যেন না ভেজে, ওর মধ্যে অনেক দামী কাপড় আছে।

এই হুকুম দিয়ে তিনি ভৃত্যদের উটের কাছে রেখে উট কিনতে চলে গেলেন। তিনি যাবার একটু পরেই আকাশ কালো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো। মূর্খ ভৃত্যরা তখন প্যাঁটরার চামড়া যাতে না ভেজে সেইজন্যে প্যাঁটরার ভিতর থেকে দামী কাপড়গুলি বের করে তাই দিয়ে প্যাঁটরাগুলি ঢেকে দিল।

বণিক ফিরে ভৃত্যদের কাণ্ড দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, হতভাগারা! আমার সব দামী কাপড়গুলো এমন ভিজল কি করে? তোদের আমি কি করতে বলে গিয়েছিলাম?

ভৃত্যরা বলল, কর্তা, আপনি তো বলে গেলেন বৃষ্টি এলে প্যাঁটরার চামড়া যেন না ভেজে, তা আমরা তো কর্তা প্যাঁটরার চামড়াগুলো যাতে না ভেজে সেই ব্যবস্থাই করেছি তাহলে কি দোষ করলাম আমরা?

বণিক বললেন, বৃষ্টির জল চামড়ায় লাগলে ওর ভিতরকার দামী কাপড়গুলো ভিজে যাবে তাই তোদের আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যাতে চামড়াগুলো না ভেজে—হায় রে আমার কপাল! বলে বণিক কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে শহরে ফিরে এলেন।



পঞ্চতন্ত্রের গল্প

বিপদেই বন্ধুর পরিচয়

বিরাট এক বনের মধ্যে ঝিলের ধারে বাস করত চার বন্ধু—চিত্রাঙ্গ নামে এক হরিণ, লঘুপতনক নামে এক কাক, হিরণ্যক নামে এক ইঁদুর আর মন্থরক নামে একটি কচ্ছপ।

ওদের চারজনের মধ্যে ছিল ভারি ভাব। মন্থরক থাকত ঝিলের জলে, তার পাড়েই বিরাট বটগাছের ডালে থাকত লঘুপতনক, গুঁড়ির গর্তে থাকত হিরণ্যক আর নীচে ঝোপের মধ্যে থাকত চিত্রাঙ্গ।

লঘুপতনক মাংসের টুকরো, মিষ্টির টুকরো এনে দিত হিরণ্যককে, হিরণ্যক শস্যের দানা এনে দিত চিত্রাঙ্গকে, আর মন্থরক মাছ ধরে এনে দিত হিরণ্যককে। এই রকম সকলে সকলের জন্যে কিছু না কিছু করত।

এদিকে এক মহাপাজি শিয়াল হরিণকে বিপদে ফেলবার জন্যে তক্কে তক্কে ছিল। একদিন সুযোগ মতো চিত্রাঙ্গকে একলা পেয়ে সে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বলল, ভাই হরিণ, তুমি তোমার তিন বন্ধুকে দারুণ ভালোবাসো, কিন্তু ওরা তোমাকে মোটেই ভালোবাসে না।

বাজে কথা বোলো না—চিত্রাঙ্গ ধমকে উঠল, ওদের সম্বন্ধে যদি বাজে কথা বল তাহলে তোমার সঙ্গে কথাই বলব না আমি।

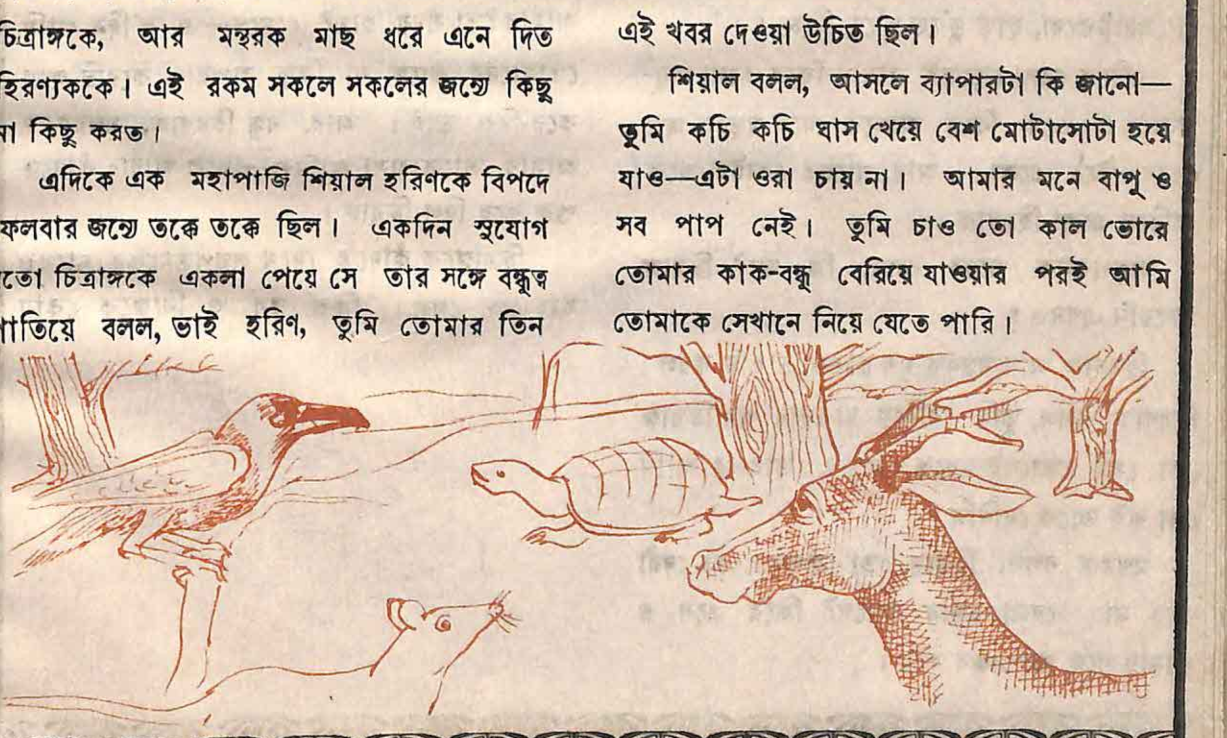
আহাহা, চটছ কেন? শিয়াল বলল, আসলে আমি কি বলতে চাই জানো—ওরা তোমার মোটেই ভালো চায় না।

হঠাৎ তোমার এমন কথা মনে হলো কেন? চিত্রাঙ্গ জানতে চাইল।

এই তো দেখ না, শিয়াল বলল, একটু দূরেই যে সুন্দর সবুজ ঘাসের মাঠ আছে তা কি তোমার কাক-বন্ধু তোমাকে বলেছে? ও তো উড়ে উড়ে সবই দেখতে পায়।

চিত্রাঙ্গ ভাবল—সত্যিই তো, লঘুপতনক উড়ে বেড়াবার সময় সবই দেখতে পায়। ওর তো তাকে এই খবর দেওয়া উচিত ছিল।

শিয়াল বলল, আসলে ব্যাপারটা কি জানো—তুমি কচি কচি ঘাস খেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে যাও—এটা ওরা চায় না। আমার মনে বাপু ও সব পাপ নেই। তুমি চাও তো কাল ভোরে তোমার কাক-বন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার পরই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।





বোকা চিত্রাঙ্গ ধূর্ত শিয়ালের কথায় ভুলে পর-দিনই লঘুপতনক উড়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আর শিয়াল তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল জাল পেতে রাখা একটি ক্ষেতে।

জালে আটকা পড়ে ছটফটিয়ে উঠল চিত্রাঙ্গ আর শিয়াল যেন চোখের সামনে দেখতে পেল চাষীটা হরিণের মাংস খেতে খেতে তার দিকে মাংসের টুকরো, হাড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

এদিকে বেলা চড়তেই বাসায় ফিরে এলো লঘু-পতনক। ওকে ফিরে আসতে দেখে মন্থরক জল থেকে উঠে এলো। আর, গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এলো হিরণ্যক।

লঘুপতনক ওদের বলল, কি ভাই, চিত্রাঙ্গ ফেরেনি এখনও ?

হিরণ্যক আর মন্থরক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হিরণ্যক বলল, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর চিত্রাঙ্গ তো সেই ভোরেই চরতে গেছে। তারপর আমি তো কই তাকে দেখিনি !

মন্থরক বলল, চিত্রাঙ্গ তো কখনও এত দেরী করে না! বেলা চড়ার আগেই ফিরে এসে ও আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করে।

হিরণ্যক বলল, হ্যাঁ, আমিও তো তাই জানি। আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না ভাই। লঘু-পতনক, তুমি ভাই এদিক ওদিক একটু উড়ে দেখ—

সঙ্গে সঙ্গে লঘুপতনক আকাশে ডানা মেলল। তারপর এদিক ওদিক উড়তে উড়তে দূর থেকে ও একটা হরিণকে দেখতে পেল। ও দ্রুত উড়ে সেই ক্ষেতের কাছে গিয়ে দেখতে পেল তাদেরই বন্ধু চিত্রাঙ্গ জালে জড়িয়ে পড়ে আছে।

লঘুপতনককে দেখতে পেয়েই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চিত্রাঙ্গ।

এ কি! তোমার এই দশা কি করে হলো ? লঘুপতনক অবাক হয়ে বলল।

কপাল, ভাই কপাল—চিত্রাঙ্গ বলল, তোমাদের বন্ধুত্বে অবিশ্বাস করে আমি শিয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। আর তার ফলেই আজ আমার এই দশা। যাক, তুমি এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে। আমার তো সময় হয়েই এসেছে—এ ক'দিন আমি তোমাদের কাছে যা কিছু অপরাধ করেছি ক্ষমা করে দিও ভাই। আর, বন্ধু হিরণ্যক, মন্থরককে আমার ভালোবাসা জানিও— বলে আবার কাঁদতে শুরু করে দিল চিত্রাঙ্গ।

চিত্রাঙ্গকে কাঁদতে দেখে লঘুপতনকের চোখেও জল এসে গেল। কিন্তু তবু ও নিজেকে কোন



রকমে সামলে নিয়ে বলল, এ কি! কাঁদছ কেন? এমন ভেঙে পড়তে হয় নাকি?

চিত্রাঙ্গ বলল, ভাই, আর কিছুক্ষণ পরেই যার মৃত্যু নিশ্চিত সে ভেঙে পড়া ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে।

না, কখনই তা হতে পারে না—লঘুপতনক সাহস দিল চিত্রাঙ্গকে, আমাদের মতো তিন তিন বন্ধু থাকতে কখনই এভাবে মৃত্যু হতে পারে না তোমার। এই বলে লঘুপতনক তার ডানায় যত জোর আছে—তত জোরে উড়ে এলো ঝিলে। তারপর বন্ধু হিরণ্যক আর মন্থরককে জানালো চিত্রাঙ্গর বিপদের কথা।

লঘুপতনকের কথা শেষ হতে না হতেই হিরণ্যক বলল, বন্ধু লঘুপতনক, আমাকে শীঘ্রি সেখানে নিয়ে চল।

লঘুপতনক যেন এটা শোনারই অপেক্ষা করছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে নিচু হলো, আর হিরণ্যক তার পিঠে উঠে চার হাত পায়ে তাকে আঁকড়ে ধরতেই লঘুপতনক উড়ে এলো চিত্রাঙ্গর কাছে।

লঘুপতনকের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল হিরণ্যক—আর ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতে কুট কুট করে কাটতে শুরু করে দিল চিত্রাঙ্গর জালের বাঁধন। লঘুপতনক উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে চারিদিকে নজর রাখতে লাগল।

চিত্রাঙ্গর প্রায় বাঁধন কাটা শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় লঘুপতনক চিৎকার করে উঠল, হায় হায়, সর্বনাশ হয়ে গেল!

চিত্রাঙ্গ বলে উঠল, কি হল ভাই? চাষীটা আসছে বুঝি?

লঘুপতনক বলল, আরে না না, মাঠের মাঝখান দিয়ে বন্ধু মন্থরক এগিয়ে আসছে। চাষী এলেই চিত্রাঙ্গ দৌড়ে পালাবে, হিরণ্যক গর্তে ঢুকে পড়বে আর আমিও উড়ে পালাব—কিন্তু বেচারা মন্থরকের কি হবে?

ইতিমধ্যে মন্থরক সেখানে গুটি গুটি এসে হাজির হলো।

হিরণ্যক চিত্রাঙ্গর শেষ বাঁধন কেটে মন্থরককে বলল, এটা তুমি কিন্তু ঠিক করনি ভাই।



মন্থরক বলল, কি করব, বন্ধু জালে আটকে পড়েছে শুনে তোমরা ওকে উদ্ধার করতে ছুটে এলে—তাই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ভাই। মরতে হলে একসঙ্গেই মরব।

বলতে না বলতেই দেখা গেল চাষী আসছে। তাকে দেখেই চিত্রাঙ্গ হিরণ্যককে পিঠে নিয়ে পাশের বনে ছুটে পালাল, আর লঘুপতনক উড়ে চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

হরিণকে পালাতে দেখে নিরাশ হয়ে পড়ল চাষী। হঠাৎই তার নজর পড়ল মন্থরকের দিকে। একটি কচ্ছপ গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। সে তখন ওটাকে ধরে ওটার চার পা বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

মন্থরককে ওই ভাবে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে দেখে কেঁদে ফেলল হিরণ্যক, হায় হায়, এক বন্ধুকে রক্ষা করতে না করতেই এ আবার কি সর্বনাশ হলো!

চিত্রাঙ্গ বলল, হায় রে আমার জন্যেই ওর ওই দশা হলো। আমি বিপদ না ঘটালে বন্ধু মন্থরক কখনই ছুটে আসত না, আর তাহলে ওর এই বিপদও ঘটত না।

থামো তোমরা! কসে ধমক লাগাল লঘুপতনক, এক বন্ধু মরতে বসেছে আর তোমরা হায় হায় করতে বসলে। শীগগির ভাবো, চাষী আমাদের নজরের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কি ভাবে বন্ধুকে বাঁচানো যায়।

কিন্তু কোন বুদ্ধিই জোগাল না চিত্রাঙ্গ আর হিরণ্যকের মাথায়—

এদিকে এগিয়ে চলেছে চাষী।

হয়েছে—লঘুপতনক চিৎকার করে উঠল, চিত্রাঙ্গ, ওই যে চাষীর যাওয়ার পথে ডোবা দেখা যাচ্ছে



তুমি দৌড়ে ওর পাশে গিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকবে। আমি তোমার মাথার ওপর বসে এমন ভাব করব যেন তোমার চোখ ঠোকরাচ্ছি। তখন চাষীটা নিশ্চয়ই তোমাকে মড়া ভেবে তোমাকে ধরবার জন্যে মন্থরককে কাঁধ থেকে নামিয়ে এগিয়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে হিরণ্যক গিয়ে মন্থরকের বাঁধন কেটে দেবে, বাঁধন কেটে দিলে মন্থরক ডোবায় ডুব দেবে। ওদিকে আমি কা কা করে উঠব আর সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গ উঠে পড়ে বনে পালাবে।

তো ঠিক তাইই হলো। চাষীটা ডোবার কাছাকাছি এসে একটা হরিণকে পড়ে থাকতে দেখে ভাবল—জালে পড়া হরিণটা নিশ্চয়ই জাল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে এসে মরে পড়ে আছে। এই ভেবে সে মন্থরককে ডোবার পাশে নামিয়ে মরা হরিণ আনবার জন্যে ডোবার অন্য দিকে হাঁটা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে লঘুপতনক চিত্রাঙ্গর মাথা থেকে নেমে হিরণ্যককে পিঠে নিয়ে এসে নামল মন্থরকের কাছে। আর হিরণ্যক লঘুপতনকের পিঠ থেকে নেমে দ্রুত কেটে চলল মন্থরকের বাঁধন।

মন্থরকের বাঁধন কাটা শেষ হতেই মন্থরক ডোবার দিকে এগিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে লঘুপতনক কা কা করে ডেকে উঠল। আর, চাষীর প্রায় ধরে ফেলা নাগালের মধ্যে থেকে চিত্রাঙ্গ উঠে পড়ে চোঁ চোঁ দৌড় দিল বনের দিকে।

চাষী হাঁ হয়ে গেল—ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি সে ফিরে এলো ডোবার এপারে—হায় হায়, বাঁধনটাই পড়ে আছে—তার মধ্যে থেকে কচ্ছপ উধাও! কি আর করে বেচারী—সে নিজের মন্দ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ির পথ ধরল।

আর ওদিকে তখন মহানন্দে নিজেদের ঝিলের দিকে এগিয়ে চলেছে চার বন্ধু—প্রথমেই উড়ে চলেছে লঘুপতনক, তার পিছনে মন্থরকের পিঠে হিরণ্যক, আর কোন বিপদ এলে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়ার জন্য সব শেষে রয়েছে শিং বাগিয়ে চিত্রাঙ্গ।



জাতকের গল্প

বাসনা বিষ

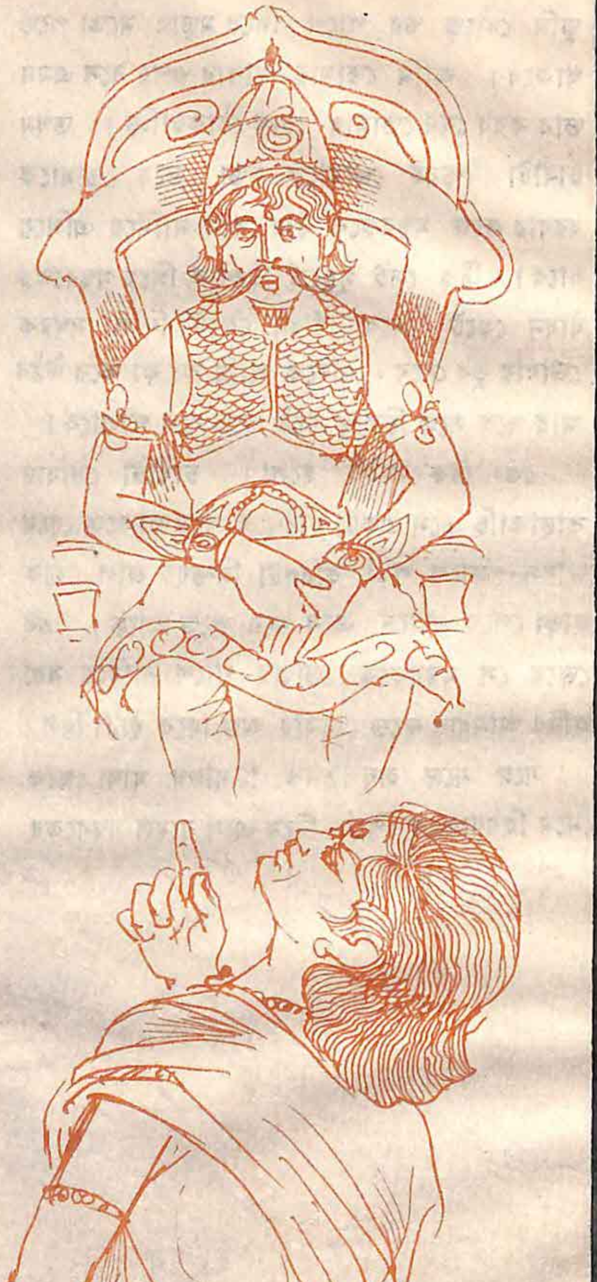
বারাণসীরাজের দুটি পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ কুমার রাজা হলো আর কনিষ্ঠ কুমার দাদার সহকারী হিসাবে রাজকার্যে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কুমার অর্থাৎ যে রাজা হলো তার বিষয় সম্পত্তি, টাকাকড়ির ওপর প্রচুর লোভ ছিল, তাছাড়া সে ভোগ ও কামনা বাসনারও দাস ছিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে দেবলোকের রাজা হয়েছিলেন। তিনি দেবলোক থেকে জম্বুদ্বীপের দিকে দৃষ্টিপাত করে রাজার হীন চরিত্রের বিষয় জানতে পারলেন। তিনি ঠিক করলেন যে রাজাকে তিনি এমন এক শিক্ষা দেবেন যাতে রাজা নিজেই নিজের নীচতা বুঝতে পেরে লজ্জা পায়।

এই ভেবে তিনি একদিন ব্রাহ্মণকুমারের রূপ ধরে রাজসভায় এসে হাজির হলেন।

রাজা তাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না জানিয়ে অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে প্রশ্ন করল, কি হে ব্রাহ্মণকুমার, তুমি কি জন্যে এসেছ?

ইন্দ্রদেব বললেন, মহারাজ, আমি এমন তিনটি নগরের কথা জানি যেখানে প্রচুর শস্যাদি, অজস্র হাতি-ঘোড়া-রথ এবং সোনার অলঙ্কার আছে। যদি সামান্য কিছু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ওই নগর তিনটিতে আক্রমণ চালানো যায় তবে সহজেই নগর তিনটি দখল করে নেওয়া যায়। আমি ওই নগর



তিনটি অধিকার করে আপনাকে দান করবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

ধন সম্পদের লোভে রাজার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। রাজা বলল, বলুন, কবে কখন আমাদের যাত্রা করতে হবে?

বোধিসত্ত বললেন, মহারাজ, আগামীকালই আমি যাত্রা করতে চাই।

ঠিক আছে, আপনি তাহলে এখন যান, কাল ভোরেই চলে আসুন। রাজা বলল।

ঠিক আছে, আপনি ইতিমধ্যে আপনার সৈন্য-সামন্ত সাজিয়ে রেখে দিন। এই বলে বোধিসত্ত দেবলোকে চলে গেলেন।

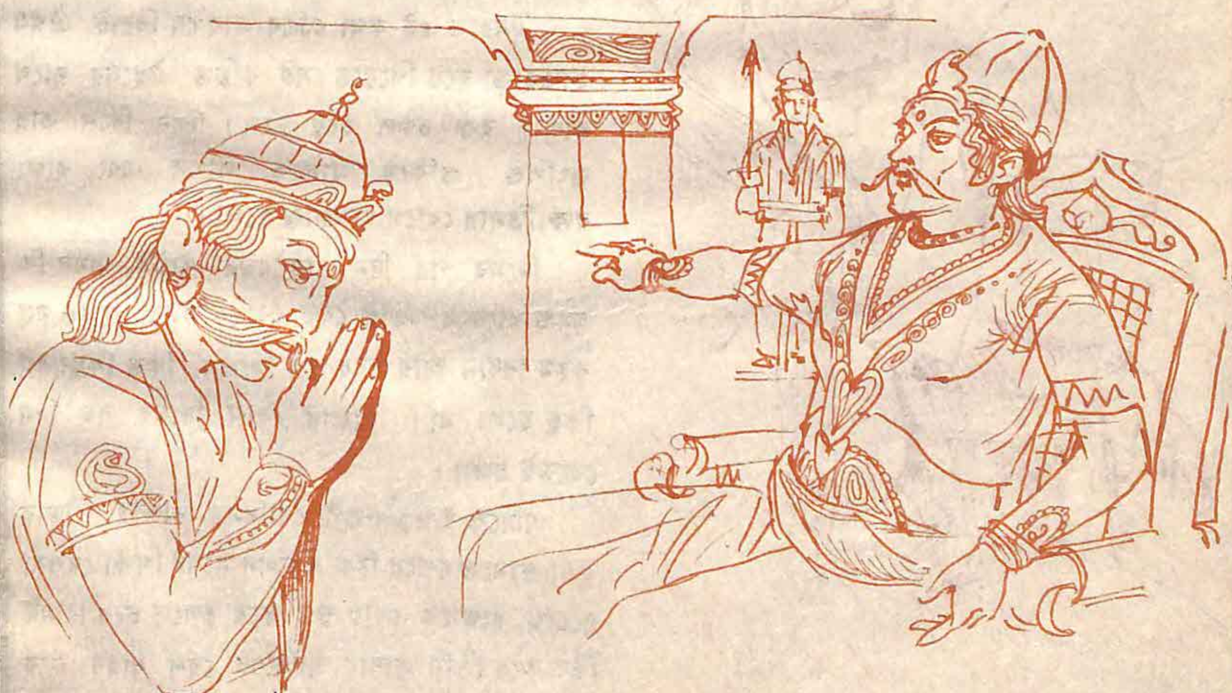
পরদিন ভোরে রাজা তূরী-ভেরী বাজিয়ে সেনা-পতিদের ডেকে যথা শীঘ্র সম্ভব সৈন্য-সামন্ত সাজিয়ে ফেলতে বলল। তারপর মন্ত্রী এবং পাত্র-মিত্রদের ডেকে বলল, কাল এক ব্রাহ্মণকুমার এসে বলেছিলেন যে তিনি উত্তর পঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ আর কেকয়—এই তিনটি নগর জয় করে আমাকে দেবেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ওই নগরে যাব। আপনারা তাকে শীঘ্রি এখানে আনবার ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, কই তেমন কোন ব্রাহ্মণকুমারকে তো কাল আমরা রাজসভায় আসতে দেখিনি! তিনি কোথায় থাকেন তা কি আপনাকে বলেছিলেন? আপনি কি কাউকে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন?

মহারাজ বলল, কই না তো, তেমন কোন আদেশ দিইনি।

তাহলে আর আমরা তাকে কোথায় খুঁজে পাব মহারাজ?

বাজে কথা বোলো না—গর্জে উঠল মহারাজ,





একজন জলজ্যান্ত মানুষ তো রাতারাতি উবে যেতে পারে না। পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে নগরের চারি-দিকে খোঁজ কর।

মহারাজের হুকুম মতো তাই করলেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে পাত্র-মিত্র সবাই। সকাল থেকে সারা দুপুর সর্বত্র তন্নতন্ন করে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হলো, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুমারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। দিনের শেষে সেই কথাই এসে জানালেন মন্ত্রী, মহারাজ, আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

এই খবর শুনে রাজা রীতিমত ভেঙে পড়ল। ভাবতে লাগল—হায় হায়, নিজের দোষেই আমি বিরাট সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলাম। ইস, কেন আমি আমার প্রাসাদে কিম্বা অতিথিশালায় তার আহার ও থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম না? কিংবা সে কোথায় থাকে তার খোঁজ নিলাম না?

দিনরাত এই কথা ভেবে আর যে বিরাট ঐশ্বর্য হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে সেই কল্পিত ঐশ্বর্যের দুঃখে রাজার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। দিনে দিনে তার হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে আসতে লাগল এবং রাজা রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হলো।

দিনের পর দিন রাজবৈদ্যরা বটেই, এমন কি সমগ্র রাজ্যের অন্যান্য বৈদ্য এবং হেকিমরা এসেও বহু রকম বিধান আর ওষুধ-পত্র দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রাজার রোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলল।

এদিকে ইন্দ্রদেব-রূপী বোধিসত্ত্ব রাজার পীড়ার কথা জানতে পেরে ঠিক করলেন যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, রাজাকে এবার সুস্থ করে তুলতে হবে। এই স্থির করে তিনি আবার ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে

রাজপ্রাসাদে এলেন, তারপর মহারাজকে খবর পাঠালেন—মহারাজ, আমি এক ভিন্‌দেশী ব্রাহ্মণ বৈদ্য, আপনার দুরারোগ্য রোগের কথা শুনে চিকিৎসার জন্যে এসেছি।

রাজা তাচ্ছিল্য ভরে বলল—বড় বড় সব রাজবৈদ্য এসে যেখানে কিছুই করতে পারল না—সেখানে কোথাকার কোন্ ভিন্‌দেশী বৈদ্য এসেছেন আমাকে সারিয়ে তুলতে—হুঁঃ। ওকে পথ-খরচ দিয়ে বিদায় করে দাও।

ব্রাহ্মণ রূপী বোধিসত্ত্ব এ কথা শুনে বলে পাঠালেন, রাজাকে গিয়ে জানান, পথ-খরচ অথবা দর্শনী কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই আমার।

রাজা এ সংবাদ শুনে তার সম্পর্কে কৌতূহলিত হয়ে তাকে আসবার অনুমতি দিল।

বোধিসত্ত্ব রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে 'মহারাজের জয় হোক' বলে রাজার শয্যার পাশেই আসন গ্রহণ করলেন।

রাজা বলল, আপনি আমার রোগের চিকিৎসা করতে এসেছেন?

হ্যাঁ মহারাজ।

ঠিক আছে, করুন কি চিকিৎসা করবেন।

যে আজ্ঞা। কিন্তু তার আগে আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার রোগের লক্ষণ বলুন। কি খেয়ে বা পান করে অথবা কি দেখে বা শুনে এমন অবস্থা হলো আপনার?

মহারাজ বলল, বাপু হে, আমার এই অসুখ শ্রবণজাত, মানে শুনে হয়েছে।

আপনি কি শুনেছেন?

এক ব্রাহ্মণকুমার এসে আমায় বলেছিলেন যে তিনি তিনটি নগর জয় করে আমাকে দেবেন আমি





তখন তার আহার অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিইনি। সেই জন্যেই বোধ হয় তিনি রাগ করে আমার কাছে না এসে অন্য কোন রাজার কাছে চলে গেছেন। তিনি আসার ফলে প্রচুর ঐশ্বর্য আমার প্রায় হাতে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল—এমন চিন্তা করতে করতেই আমার এই রোগ দেখা দিয়েছে। আপনার কি এই দুরাকাঙ্খা-জনিত রোগের কোন চিকিৎসা জানা আছে?

বোধিসত্ব বললেন, জানি মহারাজ। তবে কোন ওষুধে আপনার এই রোগের চিকিৎসা হবে না। জ্ঞানরূপ ওষুধ দিয়েই আপনার এই রোগ ভালো করতে হবে।

জ্ঞানরূপ ওষুধ?

হ্যাঁ মহারাজ। মনে করুন আপনি সেই তিনটি নগর পেয়েই গিয়েছেন—সুতরাং আপনি এখন চারটি নগরের রাজা—কিন্তু তার ফলে কি আপনি চার জোড়া কাপড় পরবেন? আপনি কি একসঙ্গে চারটি সোনার থালায় আহার করবেন? কিংবা আপনি কি চারটে বিছানায় শোবেন? মহারাজ, কখনই বাসনার দাস হওয়া উচিত নয়। এই বাসনাই সমস্ত দুঃখের মূল। এই বাসনাই বাড়তে বাড়তে মানুষকে নরকে টেনে নিয়ে যায়।

এই ভাবে জ্ঞানরূপ ওষুধ দিয়ে বোধিসত্ব মহারাজকে সুস্থ করে তুললেন।

কথামালার গল্প

সারসী ও তার বাচ্চা

শস্যক্ষেতের পাশেই একটি গাছে এক সারসী তার বাচ্চাদের নিয়ে থাকতো। ওই ক্ষেতের শস্য পেকে উঠলে সারসী বুঝতে পারল যে এবার কৃষকরা ক্ষেতের শস্য কাটতে আসবে। তাই প্রতিদিন সে খাবারের খোঁজে বেরোবার আগে বাচ্চাদের বলে যেত—এই গাছের আশেপাশে এসে লোকেরা যা যা বলবে, আমি ফিরে এলে তোমরা সবই আমাকে বলবে।

একদিন সারসী বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের মালিক সেখানে এলো। তারপর চারিদিক দেখে নিয়ে বলল, সব শস্যই পেকে গেছে দেখছি, অমুক অমুক চাষীকে ডেকে পাঠিয়ে শস্য কেটে নিয়ে যাওয়ার ভার দিতে হবে।

সেদিন সারসী বাসায় ফিরে এলে বাচ্চারা ক্ষেতের মালিকের সমস্ত কথা অবিকল জানিয়ে বলল, শীঘ্রি তুমি আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর মা। যারা শস্য কাটতে আসবে তারা আমাদের দেখলেই মেরে ফেলবে!

সারসী বলল, ভয় পেও না বাছারা। যেখানে ক্ষেতের মালিক শস্য কাটার ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে সেখানে বুঝতে হবে শস্য কাটার অনেক দেরী আছে।

পরের দিন ক্ষেতের মালিক তার ছেলেকে সঙ্গে করে মাঠে এসে দেখল কেউই শস্য কাটতে আসেনি। এদিকে শস্য এমনই পেকে উঠেছে যে এবার না কাটলে ক্ষতি হতে পারে। তাই সে ছেলেকে বলল, নাঃ, আর দেরি করা যায় না। চাষীরা যখন এলই না তখন তুমি আমার বন্ধু আর তোমার খুড়োদের বোলো—তারা কালই এসে যেন শস্য কেটে নিয়ে যায়। এই বলে ক্ষেত-মালিক ছেলের সঙ্গে চলে গেল।





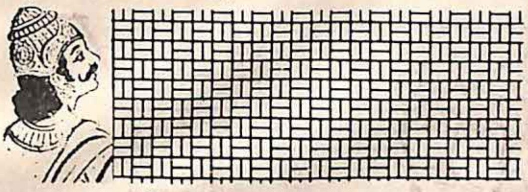
ওদের কথা শুনে সারসীর বাচ্চারা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সারসী বাসায় ফিরে আসামাত্র সব কথা জানিয়ে বলল, এবার তুমি আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা কর মা।

সারসী বলল, তোমরা আমাকে যা বললে কেবল যদি সেটুকুই শুনে থাক তবে এখনও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ক্ষেত-মালিকের বন্ধু আর তার ভাইদের ক্ষেতের শস্যও পেকে গেছে। সুতরাং তারা আগে নিজেদের শস্য না কেটে কখনই এ ক্ষেতের শস্য কাটতে আসবে না। তবে কাল ক্ষেতের মালিক যা বলবে তা মন দিয়ে শুনে আমাকে জানিও।

পরদিন সকালে সারসী বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের মালিক এসে দেখল কেউই শস্য কাটতে আসেনি। আর শস্য খুব বেশী পেকে যাওয়ায় মাঠে ঝরে ঝরে পড়ছে। তখন সে বিরক্ত হয়ে ছেলেকে বলল, দেখ, ভাই বা বন্ধুদের আশায় আর বসে থাকা উচিত হবে না। আজ রাতে যতজন ঠিকে চাষী পাও ঠিক করে রাখবে। কাল সকালে তাদের নিয়ে আমরা নিজেরাই শস্য কাটতে আসব।

সারসী বাসায় ফিরে ছানাদের কাছে এই সমস্ত কথা শুনে বলল, আর এখানে থাকা যাবে না। আজই অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কারণ, যখন কেউ, কোন কাজের ভার অন্যের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত না থেকে নিজেই করতে উদ্যোগী হয় তখন জানতে হবে সে সত্যিই ওই কাজ এবার করবে।

হিতোপদেশের গল্প



শূদ্রক ও বীরবর

একদিন রাজা শূদ্রক রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক রাজসভায় এসে রাজাকে অভিবাদন করে বলল, মহারাজ, আমি এক কর্মপ্রার্থী। যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে তবে দয়া করে আমায় রাখতে পারেন।

রাজা বললেন, রাখব তো, কিন্তু তার জন্যে তোমাকে কি দিতে হবে?

সেই লোকটি বলল, আজ্ঞে আমার বেতন প্রতিদিন চারশো মুদ্রা।

রাজা বললেন, এত যে বেতন চাও, তা তোমার অস্ত্র কোথায়? আর তোমার নামই বা কি?

লোকটি বলল, আজ্ঞে আমার নাম বীরবর। আমার অস্ত্র—বলে সে তার হাত দুখানি ও তলোয়ার দেখিয়ে বলল, আমার এই হাত দুটি ও এই তলোয়ার।

রাজা বললেন, ব্যস, এই তোমার অস্ত্র! আর তার জন্যে তুমি চাও প্রতিদিন চারশো মুদ্রা! না না, এ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। বলে তিনি মাথা নাড়লেন।

আচ্ছা মহারাজ। বলে বীরবর মাথা নুইয়ে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মন্ত্রীরা রাজাকে বললেন, মহারাজ, একে চারদিনের জন্যে রেখে কাজ-কর্ম দেখতে পারেন। তারপর উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করবেন।

রাজা তখন বীরবরকে ডেকে তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন।

বীরবর কাজে লেগে গেল। আর রাজা লক্ষ্য রাখলেন বীরবর টাকাটা কিভাবে খরচ করে। তিনি দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে বীরবর রোজ যে চারশো মুদ্রা পায় তার অর্ধেক দেবতা ও ব্রাহ্মণদের দান করে। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দরিদ্রদের বিলিয়ে দেয়, আর বাকি অর্ধেক নিজের ভরণপোষণের জন্যে রাখে। তারপর নিজের জন্যে যেটুকু কাজ না করলে নয় সেটুকু করেই ও রাজপ্রাসাদে চলে এসে তলোয়ার নিয়ে দিনরাত প্রহরীর কাজ করে।



এভাবেই চলছিল দিন। হঠাৎ এক কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রাত্রিবেলা রাজা শুনতে পেলেন একজন স্ত্রীলোক করুণ সুরে বিলাপ করে কাঁদছে। রাজা তক্ষুণি বীরবরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, বীরবর, কে কাঁদছে খবর নাও দেখি।

যথা আজ্ঞা মহারাজ। বলে বীরবর তক্ষুণি ছুটে বেরিয়ে গেল।

বীরবর চলে যাওয়ার পর রাজার মনে হল, রাত্রে বীরবরকে একা পাঠিয়ে কাজটা ভাল করলাম না, ওর পিছনে আমারও যাওয়া উচিত।

এই ভেবে রাজাও একটা তলোয়ার নিয়ে বীরবরের পিছন পিছন চললেন। বীরবর কিন্তু টেরও পেল না। বীরবর কান্না অনুসরণ করে নগরের বাইরে গিয়ে দেখে কি সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিতা অপূর্ব রূপময়ী এক নারী এক জায়গায় বসে কেঁদেই চলেছেন।

বীরবর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, আপনি কে? কাঁদছেনই বা কেন?

রূপসী বললেন, আমি এ রাজ্যের রাজা শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী। আমি বহুদিন এখানে ছিলাম, কিন্তু আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে রাজা মারা যাবেন। তাই আমি আর এখানে থেকে কি করব? আমাকে চলে যেতে হবে—তাই কাঁদছি।

বীরবর বলল, এর কি কোন প্রতিকারের উপায় নেই মা?

রাজলক্ষ্মী বললেন, উপায় থাকবে না কেন। কিন্তু তুমি কি তা পারবে? তুমি যদি তোমার বত্রিশ লক্ষণযুক্ত পুত্র শক্তিধরকে ভগবতী সর্বমঙ্গলা দেবীর কাছে বলি দিতে পারো তবে রাজা একশো-বছর বাঁচবে, আর আমিও থেকে যাব। বলেই



তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দেবীর মুখে এই কথা শুনে বীরবর তক্ষুণি বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে সব কথা খুলে বলল। তার কথা শুনে শক্তিধর বলল, বাবা, চলুন। আর দেরি করছেন কেন? এমন সুযোগ কি আর আসবে আমাদের জীবনে? আপনি তো জানেন—পণ্ডিতরা ধন আর জীবন পরার্থে দান করেন। মৃত্যু যখন হবেই তখন তা সংকাজে দান করাই শ্রেয়।

বীরবরের স্ত্রী বলল, প্রভু, এ যদি না করা হয়, তবে রাজার দেওয়া বেতনই তো পরিশোধ করা হবে না।

তাহলে চল! বলে বীরবর সকলকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেবী সর্বমঙ্গলার পুজা করে বলল, দেবী প্রসন্ন হোন, রাজার জয় হোক। এই বলেই খড়্গাঘাতে সে তার নিজের ছেলের শিরশ্ছেদ করল। তারপর সে ভাবল, রাজার বেতন তো পরিশোধ হল, কিন্তু পুত্রহীন জীবন বৃথা। এই ভেবে সে সেই খড়্গ নিজের গলায় বসিয়ে দিল। হায় হায় করে উঠল বীরবরের স্ত্রী। কিন্তু সে-ও তখন স্বামী-পুত্র ছাড়া জীবন বৃথা বলে খড়্গ বসিয়ে দিল নিজের গলায়।

রাজা এ সব দেখেশুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন—এমন লোকও পৃথিবীতে আছে! আমার মত হীন প্রাণী জন্মায় ও মরে, কিন্তু এর মত লোক অতীতে জন্মায়নি ভবিষ্যতেও জন্মাবে না। তাহলে আমার এই জীবন রেখে লাভ কি? এই ভেবে তিনি নিজের তরবারী গলায় বসাতে যাবেন কি দেবী সর্বমঙ্গলা তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, ক্ষান্ত হও বৎস। আমি তোমার সাহসে মুগ্ধ হয়েছি। বল, তুমি কি চাও?

মা, মাগো! রাজা সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে বললেন, আমি ধন চাই না, রাজ্য চাই না। যদি তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে এই বীরবর এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দাও।

দেবী বললেন, ভৃত্যের প্রতি তোমার ভালবাসায় আমি খুব খুশি হয়েছি বৎস। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বীরবর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে নিজের প্রাণ ফিরে পেয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বীরবর বলল, মহারাজ, আপনার আদেশে কান্না অনুসরণ করে ছুটে গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি আমি।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন। গতকাল রাতে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা রাজাকে শুনিয়ে নিজের সাহসিকতা অথবা প্রশংসাও চায় না এ লোক—এ তো সাধারণ মানুষ নয়। এই ভেবে তিনি বীরবরকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।



বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প

সিংহকে জীবন দান

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের চারটি ছেলে ছিল। তার মধ্যে বড়টি জুয়াড়ী, মেজটি চোর, সেজটি বেহায়া এবং ছোটটি নাস্তিক।

কালে বিষ্ণুস্বামীর মৃত্যু হলে চার ভাই ঠিক করল, এখানে থেকে কি খেয়ে বাঁচব আমরা, তার চেয়ে চল যজ্ঞস্থলে মামার বাড়ি যাই, সেখানে নিশ্চয়ই দুমুঠো জুটবে আমাদের।

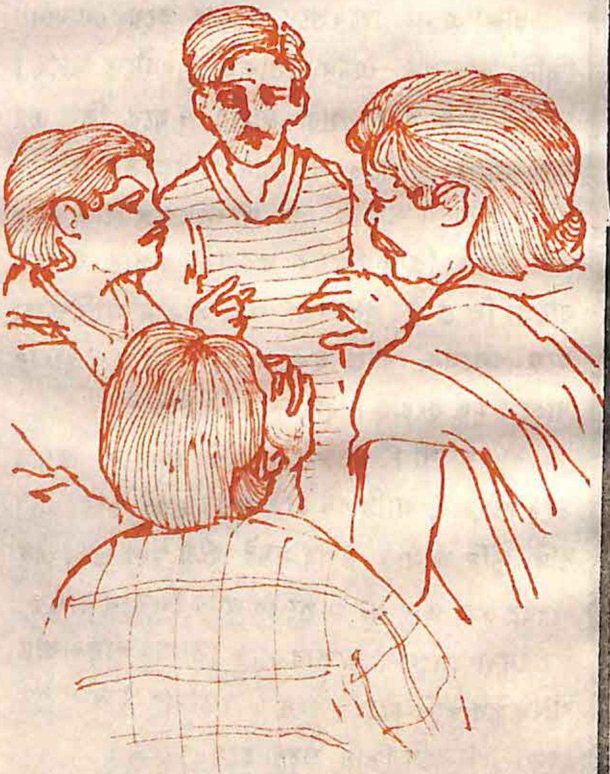
এই ভেবে তারা চার ভাই যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হল। তাদের সত্যিই আহার ও বাসস্থান মিললো সেখানে। চার ভাই সেখানে থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করতে লাগল। কিন্তু নিঃস্ব ভাগ্নেদের কত দিন আর মামারা পুষবেন? ক্রমেই তাদের প্রতি মামার অবহেলা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারল। বড় ভাই মনের দুঃখে একদিন তিন ভাইকে বলল, আর চুপ করে থেকে কি হবে, বুঝছ তো সব? এখন কি করা যায় বল।

ছোট ভাইরা বলল চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে আমরা এমন বিদ্যা শিখব যাতে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখা যায়।

সবাই তখন ঠিক করল পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে দিব্য বিদ্যা অর্জন করে তারা এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হবে।

এই ঠিক করে চার ভাই চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। একজন গেল পূবে, একজন গেল পশ্চিমে, একজন উত্তরে, আর একজন গেল দক্ষিণে। তারপর সারা পৃথিবী ঘুরে দিব্য বিদ্যা অর্জন করে তারা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হলো।

এরপর প্রশ্ন উঠল—কে কি বিদ্যা শিখে এসেছে। একজন বলল, আমি মৃত জীবের হাড়ে মাংস বসিয়ে দিতে পারি। দ্বিতীয়জন বলল, আমি সেই দেহের ওপর চামড়া এবং লোম বসিয়ে দিতে পারি। তৃতীয় ভাই বলল, আমি ঐ জীবের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারি। আর চতুর্থ ভাই বলল, আমি সেই মৃত জীবের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি।



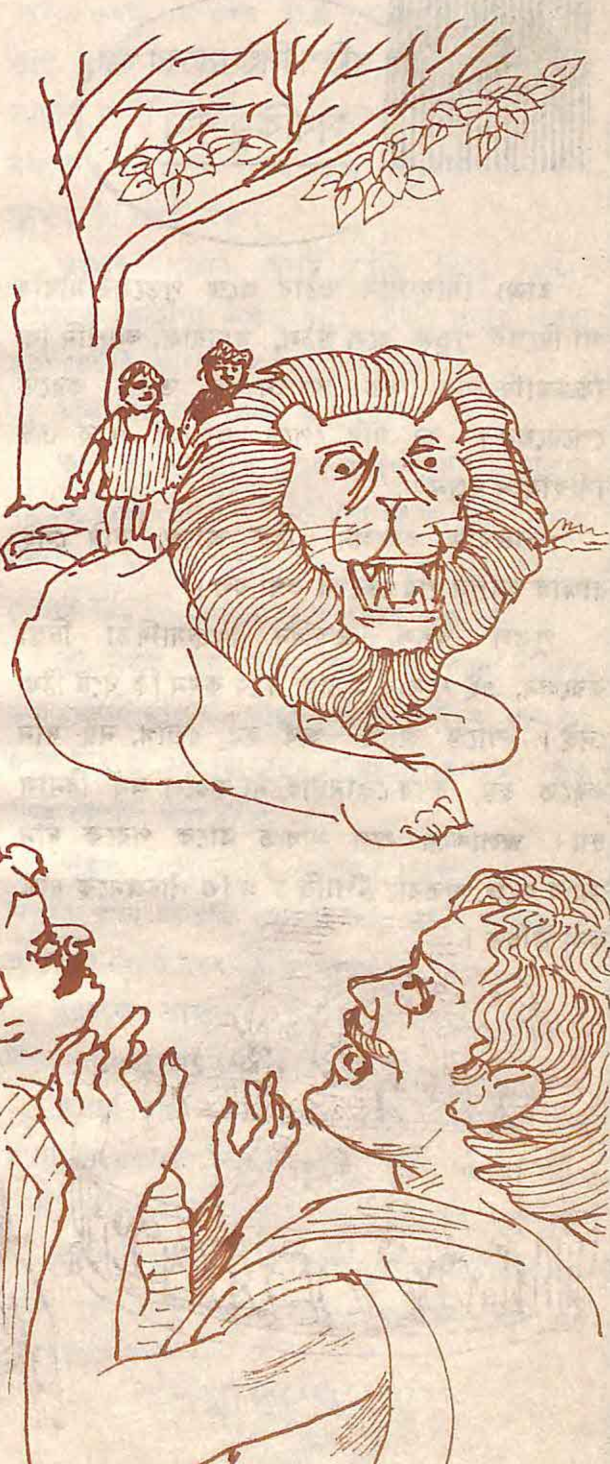
ভাল কথা, এবার তাহলে প্রত্যেকের বিদ্যা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। শুরু হল হাড় খোঁজাখুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে বনের মাঝে কয়েক-খানা সিংহের হাড় পাওয়া গেল। হাড়টা পেয়েই চার ভাই যে যার নিজের নিজের বিদ্যা জাহির করতে মেতে উঠল।

প্রথম ভাই হাড়ে মাংস লাগিয়ে দিল, দ্বিতীয় ভাই তার চামড়া আর লোম বসালো, তৃতীয় ভাই ঐ জীবের বাকী অঙ্গ জুড়ে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল। হয়ে উঠল তখন সেটা একটা সিংহের দেহ। তারপর চতুর্থ ভাই তাতে প্রাণ সঞ্চার করতেই সিংহটা জীবন্ত হয়ে উঠে থাবার এক এক ঘায়ে চার ভাইকেই শেষ করে দিল।

গল্প শেষ করে বেতাল বলল, এবার বল তো রাজা, এই যে সিংহ চার ভাইকেই শেষ করল—এর জন্যে দোষী কে?

রাজা বললেন, দোষ হচ্ছে চতুর্থজনের, যে তাকে প্রাণ দান করেছে। অন্য তিন ভাই নিজের নিজের বিদ্যা পরখ করেছে। জীবটা শেষে কি দাঁড়াবে তারা তা বুঝতেই পারেনি। শেষের জন যখন দেখল সেটা সত্যি সত্যি একটা সিংহই হয়েছে, তখন মূর্খের মতো তাতে প্রাণ সঞ্চার করা কখনই তার উচিত হয়নি।

রাজার উত্তর শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ ছেড়ে আবার সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল। আর রাজাও তাকে আবার গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে করে চলতে লাগলেন।



বত্রিশ সিংহাসনের গল্প

সবকিছু দান

রাজা সিংহাসনে ওঠার জন্যে পুতুলের মাথায় পা দিতেই পুতুল বলে উঠল, মহারাজ, আপনি কি বিক্রমাদিত্যের মত আপন-পর ত্যাগ করতে পেরেছেন ? তা যদি পেরে থাকেন তবে এই সিংহাসনে বসুন।

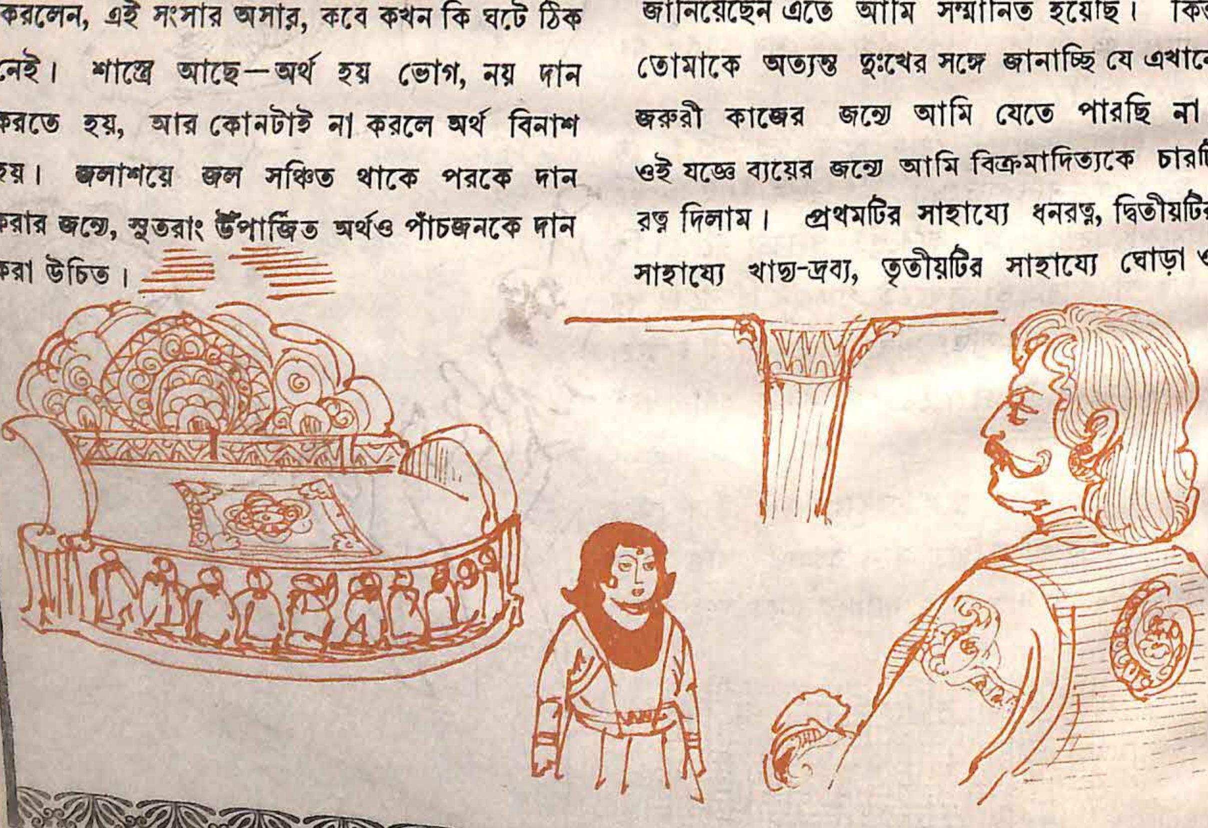
ভোজরাজ বললেন, ঠিক আছে, তুমি সেই রাজার আপন-পর ভেদের কথা বল।

পুতুল বলল, একদিন বিক্রমাদিত্য চিন্তা করলেন, এই সংসার অসার, কবে কখন কি ঘটে ঠিক নেই। শাস্ত্রে আছে—অর্থ হয় ভোগ, নয় দান করতে হয়, আর কোনটাই না করলে অর্থ বিনাশ হয়। জলাশয়ে জল সঞ্চিত থাকে পরকে দান করার জন্যে, সুতরাং উপার্জিত অর্থও পাঁচজনকে দান করা উচিত।

এই ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব-দক্ষিণা যজ্ঞের জন্যে প্রস্তুত হলেন। শিল্পীরা সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরির কাজে লেগে গেল। দেবতা, মুনি, যক্ষ ইত্যাদি সকলকেই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানানো হলো।

এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রকে নিমন্ত্রণ করতে গেলেন। তিনি সমুদ্রতীরে গিয়ে ষোড়শ উপাচারে সমুদ্রের পূজো করে বললেন, হে সমুদ্র! বিক্রমাদিত্যের আদেশে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। এই বলে সাগরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তিনি বসে রইলেন। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পর সমুদ্র এক সাধুর বেশে ব্রাহ্মণের সামনে এসে বললেন, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এতে আমি সম্মানিত হয়েছি। কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এখানে জরুরী কাজের জন্যে আমি যেতে পারছি না। ওই যজ্ঞে ব্যয়ের জন্যে আমি বিক্রমাদিত্যকে চারটি রত্ন দিলাম। প্রথমটির সাহায্যে ধনরত্ন, দ্বিতীয়টির সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্য, তৃতীয়টির সাহায্যে ঘোড়া ও





সৈন্য এবং চতুর্থটির সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায়। তুমি এই চারটি রত্ন তাঁকে দিয়ে দিও।

ব্রাহ্মণ যখন সেই রত্ন চারটি নিয়ে উজ্জয়িনীতে এলেন তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তাঁর সমস্ত ধনরত্ন দান করে দিয়েছেন। এখন ব্রাহ্মণকে কি দেবেন? তখন তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, এই চারটি রত্নের মধ্যে তোমার যেটা খুশি তুমি সেটা নিয়ে নাও।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি বাড়ি গিয়ে একবার সকলকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। যেটা সবার পছন্দ হবে সেটাই আমি নেব।

রাজা বললেন, বেশ, তাই হোক।

তখন ব্রাহ্মণ বাড়ি গিয়ে সকলের কাছে রাজার দানের কথা বলল। সব কথা শুনে তার ছেলে বলল, যে রত্নের সাহায্যে সৈন্য পাওয়া যায় আপনি সেটাই নিন। তাহলে সুখে রাজত্ব করা যাবে।

স্ত্রী বলল, যে রত্নের সাহায্যে খাদ্য পাওয়া যায় সেটাই নাও। শাস্ত্রে আছে—জীবন ধারণের জন্যে বিধাতা অন্ন দিয়েছেন, সুতরাং অন্ন ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা উচিত না।

পুত্রবধূ বলল, যে রত্নের সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায় আপনি সেটাই নিন, কারণ অলঙ্কারের সাহায্যে দেবতাদের প্রীতি লাভ করা যায়।

এদিকে ব্রাহ্মণের ইচ্ছা যে রত্নের সাহায্যে ধনরত্ন পাওয়া যায় সেটাই তিনি নেন।

ব্রাহ্মণ তখন রাজসভায় এসে রাজাকে তাঁর সংসারের সকলের বিভিন্ন মতের কথা জানালেন। রাজা সব শুনে ব্রাহ্মণকে চারটি রত্নই দান করলেন।

কাহিনী শেষ করে পুতুল বলল. আপনিও যদি এমন সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন তবে ওই সিংহাসনে বসুন।—

আরব্যোপন্যাসের গল্প

আলাদ্দিন ও আশ্চর্য প্রদীপ



চীনদেশের এক বড় শহরে থাকত আলাদ্দিন আর তার বাবা মা। আলাদ্দিনের বাবা ছিল দর্জি, সারাদিন দোকানে জামা সেলাই করে সে যা পেতো তা দিয়েই কোন রকমে সংসার চালাতো।

পাড়ায় যত কুঁড়ে আর বেপরোয়া ছেলে ছিল আলাদ্দিনের সাথী। তারা দল বেঁধে পথে পথে খেলে বেড়াতো আর পাড়ায় পাড়ায় উৎপাত করতো। পাড়ার লোকেরা দর্জির কাছে নালিশ করে। দর্জি ছেলেকে গালাগালি দেয়, চড়-চাপড়ও মারে। তাতে ফল কিছুই হয় না,—আলাদ্দিন সেলাইও শেখে না, দোকানেও বসে না।

সংসারে অভাব-অনটন তো লেগেই আছে, তার ওপর ছেলেটাও মানুষ হলো না। চিন্তায় চিন্তায় দর্জি কয়েকদিন রোগে ভুগে মারা গেল।

এতদিন তবু একটু শাসন ছিল, এখন আর আলাদ্দিনকে পায় কে—মায়ের কথা কানেই তোলে না সে। খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া তাকে বাড়িতে দেখাই যায় না।

একদিন আলাদ্দিন পথে পথে ঘুরছে—এক যাদুকর সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে আলাদ্দিনকে দেখে ভাবল—এই ছোঁড়াকে দিয়েই কাজ হবে। এই ভেবে যাদুকর আলাদ্দিনের কাছে গিয়ে বলল, তোমার বাবা কেমন আছেন ?

আলাদ্দিন বলল, আমার বাবা তো নেই, মারা গেছেন।

শুনেই যাদুকর আলাদ্দিনের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, তার পর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

দিতে দিতে বলতে থাকল, বাছারে, আমার বরাত বড় খারাপ। তোমার বাবা আমার বড় ভাই ছিলেন, আমি তোমার চাচা হই। আমি অনেক দূর দেশে ছিলাম, দেশে ফিরেই দাদাকে দেখতে ছুটে এলাম। হায়! হায়! তা তোমার মা বেঁচে আছেন তো?

আলাদ্দিন বলল, হ্যাঁ, মা আছেন। চলুন না, ঐ তো আমাদের বাড়ি।

যাদুকর বলল, আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, কাল তোমার মায়ের সাথে দেখা করব। তুমি এই মোহর ক'টি মাকে দিয়ে আমার কথা বোলো। বলে যাদুকর আলাদ্দিনের হাতে কয়েকটা চকচকে মোহর দিয়ে চলে গেল।

আলাদ্দিন তখনই বাড়িতে এসে মাকে মোহর কটি দিয়ে চাচার কথা বলল। আলাদ্দিনের মা লোকটাকে চিনতে পারল না। তবে মোহর দেখে বুঝল, লোকটা নিশ্চয়ই তাদের কোন আপনজন। তা না হলে অতগুলো মোহর কেন দেবে?

পরদিন যাদুকর আলাদ্দিনকে পথে দেখতে পেয়ে আরও দুটো মোহর দিয়ে বলল, তুমি বাড়ি গিয়ে মাকে বোলো আজ রাতে আমি তোমাদের ওখানে খাব। এই মোহর দুটো ভাঙিয়ে তিনি যেন আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে রাখেন।

সেদিন রাতে যাদুকর আলাদ্দিনের বাড়িতে নানা রকমের ফল আর মিঠাইয়ের বাক্স নিয়ে এলো। আলাদ্দিনের মা খুব আদর করে তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

যাদুকর বলল, আমাকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন, অবাক হবারই কথা। আপনার বিয়ের আগেই আমি দেশছাড়া। বহু





দেশ বিদেশ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বিদেশে থাকতেই আপনাদের বিয়ের কথা, ছেলের কথা, সব শুনেছি, দাদাই আমাকে সব কথা জানাতেন। তিনি যে এ ভাবে হঠাৎ চলে যাবেন ভাবিনি। যাক, আমি যখন ফিরে এসেছি তখন চিন্তা নেই, এখন ছেলেটা একটু মানুষ হলেই হয়।

আলাদ্দিনের মা চোখের জল ফেলে ছেলের গুণপনার কথা বলতে লাগল। আলাদ্দিন মাথা হেঁট করে বসে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলাদ্দিনের মা যাদুকরকে বলল, ভাই, ছেলেটা যাতে মানুষ হয়, তুমি দয়া করে তার একটা উপায় করে দাও।

যাদুকর বলল, দয়ার কথা বলবেন না ভাবী, দাদা নেই, আলাদ্দিনকে মানুষ করার দায়িত্ব তো এখন আমারই। আমি কাল সকালে এসে ওকে নিয়ে যাব। কোন চিন্তা নেই। বলে যাদুকর সেদিনের মতো বিদায় নিল।

পরের দিন যাদুকর খুব ভোরে এসে আলাদ্দিনকে নিয়ে গেল। তারপর সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে শেষে শহরের বাইরে চলে এলো।

সারাদিন ঘোরাঘুরিতে আলাদ্দিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে আর হাঁটতে না পেরে বলল, চাচা, আর হাঁটতে পারছিনে। চলুন, বাড়ি ফেরা যাক।

যাদুকর বলল, চল, তোমাকে এমন এক চমৎকার বাগান দেখাব, যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। এই বলে যাদুকর কতকগুলো খড়কুটো এনে তাতে আগুন দিল, তারপর আগুনে ধূপধূনো ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে কি-সব মন্ত্র বলতে লাগল। একটু পর আগুন নিভে গেলে দেখা গেল মাটির উপরে একটা পাথর। যাদুকর ও আলাদ্দিন দুজনে

মিলে সেই পাথরখানা টেনে সরালো। দেখা গেল একটা বড় গুহা, আর গুহার একপাশ দিয়ে নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে।

যাদুকর বলল, এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও! কোন ভয় নেই, কিছুদূর এগিয়ে গেলেই দারুণ চমৎকার একটা বাগান দেখতে পাবে। বাগানের ভিতরকার সরু পথ দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে একটা উঁচু বেদির উপরে একটা সোনার প্রদীপ দেখতে পাবে—সেই প্রদীপটা নিয়ে খুব সাবধানে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ব্যস, ওটা নিয়ে আসতে পারলেই তোমাকে আমি বড়লোক করে দোব। আর হ্যাঁ, এই আংটিটা পরে নাও, তাহলে কোন বিপদে পড়বে না। এই বলে যাদুকর আলাদ্দিনকে একটা আংটি দিল।

আংটি হাতে পরে আলাদ্দিন লাফিয়ে গুহার ভেতরে নেমে গেল। তারপর যাদুকরের কথামত বাগান পেরিয়ে গিয়ে বেদীর ওপর থেকে সোনার প্রদীপটা নামিয়ে নিল।

বেদীর চারদিকে বাগান। বাগানের গাছে হীরে-জহরতের ফল-ফুলের শোভা দেখে আলাদ্দিন লোভ সামলাতে পারল না, সে গাছে উঠে যত পারল হীরে জহরত পেড়ে পকেটে পুরল, তারপর অনেক দেরী করে গুহার সামনে আসল।

গুহার মুখে কিছুটা জায়গায় সিঁড়ি নেই, একেবারে খাড়া নেমে গেছে। আলাদ্দিন সেখানে এসে যাদুকরকে ডেকে বলল, চাচা, আমার হাত ধরে ওপরে তুলে নিন।

যাদুকর বলল, প্রদীপটা আমার হাতে দাও।

আলাদ্দিন বলল, আগে আমায় ওপরে তুলুন, তারপর প্রদীপ দোব।





দেশ বিদেশ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বিদেশে থাকতেই আপনাদের বিয়ের কথা, ছেলের কথা, সব শুনেছি, দাদাই আমাকে সব কথা জানাতেন। তিনি যে এ ভাবে হঠাৎ চলে যাবেন ভাবিনি। যাক, আমি যখন ফিরে এসেছি তখন চিন্তা নেই, এখন ছেলেটা একটু মানুষ হলেই হয়।

আলাদ্দিনের মা চোখের জল ফেলে ছেলের গুণপনার কথা বলতে লাগল। আলাদ্দিন মাথা হেঁট করে বসে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলাদ্দিনের মা যাতুকরকে বলল, ভাই, ছেলেটা যাতে মানুষ হয়, তুমি দয়া করে তার একটা উপায় করে দাও।

যাতুকর বলল, দয়ার কথা বলবেন না ভাবী, দাদা নেই, আলাদ্দিনকে মানুষ করার দায়িত্ব তো এখন আমারই। আমি কাল সকালে এসে ওকে নিয়ে যাব। কোন চিন্তা নেই। বলে যাতুকর সেদিনের মতো বিদায় নিল।

পরের দিন যাতুকর খুব ভোরে এসে আলাদ্দিনকে নিয়ে গেল। তারপর সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে শেষে শহরের বাইরে চলে এলো।

সারাদিন ঘোরাঘুরিতে আলাদ্দিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে আর হাঁটতে না পেরে বলল, চাচা, আর হাঁটতে পারছিনে। চলুন, বাড়ি ফেরা যাক।

যাতুকর বলল, চল, তোমাকে এমন এক চমৎকার বাগান দেখাব, যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। এই বলে যাতুকর কতকগুলো খড়কুটো এনে তাতে আগুন দিল, তারপর আগুনে ধূপধূনো ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে কি-সব মন্ত্র বলতে লাগল। একটু পর আগুন নিভে গেলে দেখা গেল মাটির উপরে একটা পাথর। যাতুকর ও আলাদ্দিন তুজনে

মিলে সেই পাথরখানা টেনে সরালো। দেখা গেল একটা বড় গুহা, আর গুহার একপাশ দিয়ে নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে।

যাদুকর বলল, এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও! কোন ভয় নেই, কিছুদূর এগিয়ে গেলেই দারুণ চমৎকার একটা বাগান দেখতে পাবে। বাগানের ভিতরকার সরু পথ দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে একটা উঁচু বেদির উপরে একটা সোনার প্রদীপ দেখতে পাবে—সেই প্রদীপটা নিয়ে খুব সাবধানে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ব্যস, ওটা নিয়ে আসতে পারলেই তোমাকে আমি বড়লোক করে দোব। আর হ্যাঁ, এই আংটিটা পরে নাও, তাহলে কোন বিপদে পড়বে না। এই বলে যাদুকর আলাদ্দিনকে একটা আংটি দিল।

আংটি হাতে পরে আলাদ্দিন লাফিয়ে গুহার ভেতরে নেমে গেল। তারপর যাদুকরের কথামত বাগান পেরিয়ে গিয়ে বেদীর ওপর থেকে সোনার প্রদীপটা নামিয়ে নিল।

বেদীর চারদিকে বাগান। বাগানের গাছে হীরে-জহরতের ফল-ফুলের শোভা দেখে আলাদ্দিন লোভ সামলাতে পারল না, সে গাছে উঠে যত পারল হীরে জহরত পেড়ে পকেটে পুরল, তারপর অনেক দেরী করে গুহার সামনে আসল।

গুহার মুখে কিছুটা জায়গায় সিঁড়ি নেই, একেবারে খাড়া নেমে গেছে। আলাদ্দিন সেখানে এসে যাদুকরকে ডেকে বলল, চাচা, আমার হাত ধরে ওপরে তুলে নিন।

যাদুকর বলল, প্রদীপটা আমার হাতে দাও।

আলাদ্দিন বলল, আগে আমায় ওপরে তুলুন, তারপর প্রদীপ দোব।





যাত্নকর ধমক দিয়ে বলল, আগে প্রদীপটা আমার হাতে দাও, তারপর তোমাকে তুলে নোব।

যাত্নকরের জেদ দেখে আলাদ্দিনের মনে খটকা লাগল। সে ভাবল, প্রদীপটা পাওয়ার জন্যে যখন লোকটা এমন ছটফট করছে তখন সহজে এটা হাতছাড়া করা হবে না। ফলে যাত্নকরকে সে প্রদীপ দিল না। যাত্নকর যতই প্রদীপটা দিতে বলে আলাদ্দিন ততই বলে—আগে আমাকে উঠিয়ে নিন তারপর দোব।

যাত্নকর শেষটায় রেগে আলাদ্দিনকে খুব গালাগাল করতে লাগল। তবুও আলাদ্দিন যখন কিছুতেই প্রদীপটা দিল না, তখন সে গুহার মুখ পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে চলে গেল।

আলাদ্দিন সেই অন্ধকার গুহার ভিতর একা বসে কাঁদতে লাগল। সময় বয়ে যায় তবু কান্না থামে না। শেষ পর্যন্ত আলাদ্দিন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার জাগল, আবার ঘুমোল। কখন দিন যায় কখন রাত হয় টেরও পায় না। এই ভাবে না খেয়ে দু'দিন দু'রাত কেটে গেল।

শেষে না খেয়ে মরবার আগে সে শেষবারের মত গুহার মুখের পাথরটাকে সরাবার চেষ্টা করতে গেল। আর হঠাৎ তার চাচার দেওয়া আংটিটার সাথে পাথরের ঘষা লাগতেই বিরাট এক দৈত্য আলাদ্দিনের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বিকট কণ্ঠে বলল, ঐ আংটি যার হাতে থাকে, আমি তার চাকর। এখন হুকুম দাও, কি করতে হবে।

অন্য কোন সময় হলে দৈত্যের বিদ্ঘুটে চেহারা দেখে আলাদ্দিন হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কিন্তু সে তো এক রকম মরতেই বসেছে, তাই তার ভয়-ডর বলে কিছুই নেই। সে তাড়াতাড়ি বলল,

আমাকে গুহার বাইরে নিয়ে চল।

চোখের পলকে দৈত্যটা আলাদ্দিনকে গুহার বাইরে নিয়ে এলো। পৃথিবীর আলো দেখে আলাদ্দিন যেন নতুন জীবন পেল। তারপর সে একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করে করে পথ চিনে বাড়িতে ফিরে এলো।

এদিকে ছেলে বাড়ি ফিরছে না দেখে আলাদ্দিনের মা তো কেঁদে কেটে একাকার হচ্ছিল। দু'দিন পর ছেলের মুখ দেখে মা সব দুঃখ ভুলে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ ক'দিন তুই কোথায় ছিলি? তোর চাচা কোথায়?

আলাদ্দিন বলল, মা, আগে আমাকে কিছু খাবার দাও—এ দু'দিন আমি কিছুই খাইনি, তারপর সব ঘটনা বলব।

মা আলাদ্দিনকে তাড়াতাড়ি খাবার এনে দিল। খাবার খেয়ে আলাদ্দিন বলল, মা, ঐ লোকটা মোটেই আমার চাচা নয়, একটা জোচ্চোর। ও যাদু জানে, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব করেছিল। শুধু বরাতের জোরেই বেঁচে গেছি।

তারপর খাওয়া দাওয়ার পরে এ ক'দিন যা ঘটেছে আলাদ্দিন সব-কিছু মাকে বলল। মা যাদুকরের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল।

পরের দিন সকালে উঠে আলাদ্দিনের মা ভাবনায় পড়ল। ঘরে কিছুই নেই, সে আলাদ্দিনকে কিছু সুতো বাজারে বেচে আসতে বলল। আলাদ্দিন মাকে বাধা দিয়ে বলল, মা, আজ আর সুতো বেচতে যাওয়ার দরকার নেই। কাল যে প্রদীপটা এনেছি, সেটা সোনার, তবে বড় নোংরা হয়ে আছে। ওটাকেই পরিষ্কার করে দাও, ওটা বেচলে আমাদের দিন কয়েক বেশ চলে যাবে।





হীরে-জহরত যা এনেছি তা এখন বেচতে গেলে হয়তো বিপদে পড়ব, ওগুলো এখন থাক।

আলাদ্দিনের কথায় মা প্রদীপটা পরিষ্কার করতে বসল। প্রদীপ বালি দিয়ে ঘষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ এক দৈত্য তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বলল, আমি এই প্রদীপটাতে থাকি। যার কাছে এই প্রদীপ থাকে, আমি তার চাকর। বল কি করতে হবে।

কে শোনে সেই কথা আর কে-ই বা দেয় উত্তর —আলাদ্দিনের বুড়ি মা তো দৈত্যটাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আলাদ্দিন আগে আংটির দৈত্যটাকে দেখেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে দৈত্যকে বলল, যাও, এখুনি ভাল ভাল খাবার এনে দাও।

যেমনি বলা অমনি দৈত্যটা অনেকগুলো সোনার থালায় পোলাও কাবাব কোপ্তা বিরিয়ানি এনে হাজির করল। তারপর ওগুলো রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলাদ্দিন বুড়ি মা'র মুখে চোখে জল ছিটিয়ে বাতাস করতেই উঠে বসল। তারপর সোনার থালায় অত সব খাবার দেখে ছেলেকে বলল, এত সব কোপ্তা কাবাব কে এনে দিল রে?

আলাদ্দিন মাকে সব কথা খুলে বলতে বুড়ি চোখ কপালে তুলে বলল, বলিস্ কি রে! ও-সব জিন্-পরী নিয়ে খেলা করা আমাদের কাজ নয়। কাজ নেই বাছা আমাদের ও প্রদীপ ঘরে রেখে, তুই এখুনি ও আপদ বিদেয় করে আয়।

আলাদ্দিন মাকে বলল, তোমার কোন ভয় নেই মা। এ প্রদীপটার এমন গুণ আছে জেনেই যাদুকর বেটা এটা বাগিয়ে নিতে চেয়েছিল। এ প্রদীপ

আমরা কিছুতেই হাতছাড়া করব না।

এরপর প্রদীপের দৈত্যের সাহায্যে মা ও ছেলের পরম সুখে দিন কাটতে লাগল। ধন-দৌলতে তাদের কুঁড়েঘর ভরে গেল।

একদিন আলাদ্দিন শহরে বেড়াতে বেরিয়ে শুনতে পেল সেদিন শাহাজাদী বেদরোলরেদর সখীদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে যাবে। যে-পথ দিয়ে শাহাজাদী যাবে, নবাবের হুকুমে সে-পথের দোকানপাট সেদিন বন্ধ রাখতে হবে, তার ওপর পথে কোন পুরুষও থাকতে পাবে না।

নদীর যে ঘাটে শাহাজাদী যাবে, সেখানে একটা পোড়ো দালান ছিল। চালাক ছেলে আলাদ্দিন আগেই সেখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ইচ্ছা, শাহাজাদীকে সে একবার দেখবেই।

শাহাজাদী সখীদের সঙ্গে নিয়ে ঘাটে এলো। আলাদ্দিন আড়াল থেকে তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। কি অপরূপ রূপ! যেন ফুলপরী! ভাবল, আহা, শাহাজাদীকে যদি সাদি করা যেত!

আলাদ্দিন মা'র কাছে গিয়ে বলল, সেদিন যে সব হীরে-জহরত এনেছি কোন শাহানশার তোষাখানায়ও অমন দামী জিনিস নেই। তুমি এক কাজ কর মা, সেগুলো সোনার থালায় সাজিয়ে নিয়ে বাদশার দরবারে যাও—তারপর ওগুলো বাদশাকে উপহার দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বল।

আলাদ্দিনের কথা শুনে বুড়ি আকাশ থেকে পড়ল। বলল, বলিস্ কি রে হতভাগা! দর্জির ছেলে হয়ে তুই বাদশার মেয়েকে বিয়ে করতে চাস! খবরদার একথা আর মুখে আনিসনে! বাদশার কানে গেলে তোকে আর আমাকে





দুজনকেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

কিন্তু আলাদ্দিন মায়ের কোন কথাই শুনল না —জেদ ধরল মাকে শাহানশার কাছে যেতেই হবে। তার ভয় কি, কোন বিপদ ঘটলে প্রদীপের দৈত্যই তাদের বাঁচিয়ে দেবে।

মা শেষটায় রাজী হয়ে সোনার থালায় হীরে-জহরত সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে বাদশার সিংহাসনের সামনে রেখে আলাদ্দিনের সঙ্গে শাহাজাদীর বিয়ের কথা পাড়ল।

বাদশা হীরে-জহরতগুলো উল্টে-পাল্টে যাচাই করে বললেন, তোমার ছেলে কতকগুলো হীরে-জহরত উপহার পাঠিয়েছে বটে, কিন্তু তার আর কি ধন-দৌলত আছে তা আমার জানা দরকার। তাছাড়া আমার মেয়ে থাকবার মতো বাড়ি তোমার ছেলের আছে কিনা, তাও আমাকে জানতে হবে। সবকিছু দেখে শুনে তবেই আমি মতামত দোব।

বাদশার কথা শুনে আলাদ্দিনের মা দমে গিয়ে বাড়ি ফিরে আলাদ্দিনকে সব কিছু জানালো।

আলাদ্দিন বলল, তুমি ভেবো না মা, কাল সকালেই বাদশাকে আমার বাড়ি দেখিয়ে দিও।

এই বলে আলাদ্দিন প্রদীপের দৈত্যকে হুকুম দিয়ে রাজবাড়ির কাছেই রাতারাতি এমন এক বাড়ি তৈরি করিয়ে ফেলল যে বাড়ির ঘরে ঘরে সোনা-রুপো আর হীরে-জহরতের কাজ-করা আসবাব সাজানো, আর সে-রকম আসবাব বাদশা দশ পুরুষেও দেখেনি।

বাদশা পরদিন সকালে তার বাড়ির কাছেই বিশাল একটা বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বুড়ি সেদিন সকাল সকাল আরও অনেকগুলো হীরে-জহরত নিয়ে বাদশার সাথে দেখা করতে গিয়ে বাদশাকে বলল, জাঁহাপনা, ঐ যে আপনার বাড়ির কাছে নতুন বাড়িটা দেখছেন, ওটাই আমার ছেলের বাড়ি। চলুন, একবার গরীবখানা দেখে আসবেন।

বাদশা আর বাড়ি দেখবেন কি! তিনি বেশ বুঝলেন, আলাদ্দিন তাঁর মত অনেক বাদশাকে কিনে নিতে পারে।

তিনি সেদিনই আলাদ্দিনের সঙ্গে শাহাজাদীর বিয়ের ঠিক করে ফেললেন। তারপর একদিন দেশময় আনন্দ উৎসবের ভিতর দেশের সবচেয়ে ধনী আলাদ্দিনের সঙ্গে শাহাজাদী বেদরোলবেদরের বিয়ে হয়ে গেল।

লোককথার গল্প

ভদ্রেশ্বরী



এক সময় মানভূমের পঞ্চকোটি জেলার কাশীপুর রাজ্যে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করতেন রাজা নীলমণি সিংহ। প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব চালালেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল। তিনি যেমন প্রজাদের ভালোবাসতেন প্রজারাও তেমনই ভালোবাসত তাকে।

রাজার ছিল একটি মাত্র ছোট্ট মেয়ে, নাম তার ভদ্রেশ্বরী। কতটুকু সময়ই বা সে রাজপ্রাসাদে থাকে, সারাদিন খেলা করে বেড়ায় রাজার বাগানে—তার খেলার সাথী হচ্ছে আশেপাশের প্রজাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। সকাল হলেই তারা ছুটে আসে রাজার বাগানে, আর ভদ্রেশ্বরীও ছুটে যায় তাদের মাঝে।

রাজা তার মা-মরা মেয়েকে কখনও বকেন না, কিংবা ওদের সঙ্গে খেলতে বারণও করেন না। তিনি তো জানেন সকলে তাঁরই ছেলে-মেয়ে। তাইতো বিশেষ বিশেষ উৎসবে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত প্রজাদের যেমন আলাদা করে চেনাই যায় না, তেমনই প্রজাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর মেয়েকে চেনাও দুষ্কর হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে ভদ্রেশ্বরী বারো বছরে পা দিল। মেয়ের তো আর মা নেই, তাই রাজামশাই মেয়ের বিয়ের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আশেপাশে পাত্রের সন্ধানে রাজকর্মচারীদের নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময়ই এক অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটল। বীরভূম-রাজ শিকার করতে এসেছিলেন কাশীপুর



রাজ্যের বনাঞ্চলে। সারাদিন শিকারের পিছনে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে তিনি রাত্রিবাসের জন্যে কাশীপুর-রাজ নীলমণি সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি ভদ্রেশ্বরীর অতুলনীয় রূপ এবং লক্ষ্মীশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর যখন শুনলেন যে রাজকন্যার তখনও বিবাহ ঠিক হয়নি তখনই তিনি তার পুত্রের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

রাজা নীলমণি সিংহ বীরভূম-রাজের পুত্রের সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে নিয়ে খুশি হয়ে বিবাহে সম্মতি দিলেন। কেবল সম্মতিই নয়, তখনই রাজপুরোহিতকে ডাকিয়ে পাঁজি-পুঁথি দেখে শুভ দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল—ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার দিন শুভবিবাহ হবে।

রাজপ্রাসাদ জুড়ে বিবাহের সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আর রাজ্যের প্রজারা সমস্ত রাজপ্রাসাদকে ফুলমালায় সুসজ্জিত করার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। তার সঙ্গে সারা কাশীপুর রাজ্যও আনন্দে মেতে উঠল। ভদ্রেশ্বরী তো কেবল রাজকন্যা নয়, সে তো সকলেরই মেয়ে—সে তো তাদেরই মেয়ে।

ক্রমে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা এসে পড়ল। ইতিমধ্যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ তো বটেই কাশীপুর রাজ্যের রাস্তাঘাটও রীতিমত সুসজ্জিত হয়েছে। আশেপাশের রাজ্য থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসা গণ্যমান্যদের ভীড়ে রাজপ্রাসাদের চতুর্দিক গমগম করছে।

বিবাহের দিন বীরভূম-রাজ সভাসদদের নিয়ে আগেই বিবাহ মণ্ডপে এসে হাজির হলেন। কাশীপুর রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর সঙ্গে কাশীপুর-রাজ, বীরভূম-রাজ সকলেই অধীর আগ্রহে বরের আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। প্রতীক্ষা করছে

আরও একজন—সে ফুল-মালা-চন্দনে সজ্জিতা কনে ভদ্রেশ্বরী।

বিয়ের লগ্ন যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই চিন্তিত হচ্ছে সকলে—বর এখনও আসছে না কেন?

সকলের মনে যখন চরম এই উৎকণ্ঠা তখন রাজসভায় এক ঘোড়সওয়ার এসে চরম দুঃসংবাদ জানালো—পথিমধ্যে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে রাজকুমার।

হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো—সারা রাজ্য জুড়ে নেমে এলো বিষাদের কালো ছায়া। রাজা নীলমণি সিংহ প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানজীকে তিনি হুকুম দিলেন—এই লগ্নেই রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার মতো উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে।

এই সংবাদ অন্দরমহলে পৌঁছতে বেঁকে দাঁড়াল ভদ্রেশ্বরী। বাবাকে ডেকে বলল, যেদিন আমি বাগদত্তা হয়েছি, সেদিনই তো মনে মনে আমি তাকেই পতিরূপে বরণ করেছি বাবা, তাই বিয়ে আমার হয়েই গেছে।

কেবল রাজা নীলমণি সিংহই নন, উপস্থিত সকলেই ভদ্রেশ্বরীকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন তাকে বিবাহে সম্মত করাতে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো, ভদ্রেশ্বরীর মুখে এক কথা—বিয়ে আমার হয়ে গেছে।

উৎসব-মুখর রাজপ্রাসাদের কোলাহল থেমে গেল। সকলেই একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। সকলের আগে বিদায় নিয়েছেন সপারিষদ বীরভূম-রাজ—রাজকুমারের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

বিষণ্ণ রাজা সকলকে বিদায় দিয়ে অন্তঃপুরে





আসতে ভদ্রেশ্বরী বলল, আচ্ছা বাবা, আমি তো বাগদত্তা—তাই না?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, তা বটে।

ভদ্রেশ্বরী বলল, তার মানে অর্ধেক বিয়ে তো আমার হয়েই গিয়েছে, তাই না?

না, তা ঠিক নয়—রাজা আমতা আমতা করে বললেন।

না বাবা, ভদ্রেশ্বরী দৃপ্তকণ্ঠে বলল, বিয়ে আমার হয়ে গিয়েছে। তুমি দেওয়ান কাকাকে ডেকে এখুনি পালকির ব্যবস্থা করতে বল—আমি আমার স্বামীর চিতায় সহমরণে যাব।

সে কি! চমকে উঠলেন রাজা, তা কি করে হয় মা?

হয় বাবা, দৃঢ়কণ্ঠে জানালো ভদ্রেশ্বরী, তাই হবে। যদি পালকির ব্যবস্থা করে না দাও তবে আমি হেঁটেই রওনা দেব।

এরপর আর কিছুই বলার থাকে না। রাজার আদেশে দেওয়ানজী পালকি সাজিয়ে দিলেন। পালকিতে কনের সাজে উঠে বসল ভদ্রেশ্বরী। হাজার হাজার প্রজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল—জয়, ভদ্রেশ্বরীর জয়! জয় মা ভাদুমায়ের জয়!

* * *

মেয়ে চলে যাওয়ার পর শয্যা নিলেন রাজা নীলমণি সিংহ। দিনের পর দিন রাজবৈদ্যরা নানা রকম চিকিৎসা করেও তাকে সুস্থ করে তুলতে পারল না। রাজা শয্যা ছেড়ে নীচেই নামেন না।

শেষ পর্যন্ত কাশীপুর রাজ্যের সমস্ত প্রজা একদিন রাজপ্রাসাদে হাজির হয়ে রাজাকে জানালো—রাজামশাই, ভাদু তো শুধু আপনার মেয়ে ছিল না, আমাদেরও মেয়ে ছিল, তাই আমরা প্রতি বছর ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় ভাদুমাকে স্মরণ করব।

রাজা এ কথায় যেন হারিয়ে যাওয়া শক্তি ফিরে পেলেন এবং শয্যা থেকে নেমে রাজপ্রাসাদের বারান্দায় এসে প্রজাদের অভিনন্দন জানালেন।

সেই থেকেই বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মানভূমে চালু হয়ে গেল ভাদু বা ভদ্রেশ্বরীর মূর্তি গড়ে 'ভাদুপুজো'।

ভিনদেশী গল্প

অদৃশ্য কাপড়

এক দেশে এক রাজা ছিল। সে দিন-রাত নানা রকম কাপড় পরতে ভালোবাসত। রাজ্য চালানোর দিকে তার যত না মন ছিল তার চেয়েও বেশি নজর ছিল সাজগোজের দিকে। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে কাপড় বদলাত।

রাজার এই কাপড় ভালোবাসার কথা সারা দেশের লোক জানত। কেবল তাই নয়, এ কথা আশেপাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাই একদিন পাশের এক দেশ থেকে তুজন জোচ্চোর ওই দেশে এলো। তারপর তারা রাজসভায় হাজির হলো।

রাজা ওদের দেখেই বিদেশী বলে চিনতে পারলেন। তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

জোচ্চোর তুটি বলল, মহারাজ, আমরা জাতিতে তাঁতী। আমরা আপনার কাজে লাগতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করব।

তোমরা কি কাপড় বুনতে জানো? রাজা জানতে চাইলেন।

মহারাজ, আমরা সোনার সুতো দিয়ে কাপড় বুনতে পারি—একজন জোচ্চোর বলল।

আর তাতে হীরের ফুল, পান্নার পাতা আর নীলার পাখি বসিয়ে দিতে পারি, তাছাড়া সে কাপড় এমনই হবে যে, উঁচু বংশের লোক ছাড়া কেউই দেখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন জোচ্চোর বলে উঠল।

এ কথা শুনে রাজা ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। প্রশ্ন করলেন, সে রকম কাপড় বুনতে কতদিন সময় লাগবে?

আজ্ঞে যদি সাধারণের ওপর করতে হয় তবে মাস খানেক লাগবে। আর তার চেয়েও ভালো করতে হলে মাস তুয়েকের আগে হবে না।



রাজা মনে মনে হিসেব করে দেখলেন যে তিনি মাস তিনেক পরে বিশেষ একটি উৎসবে যোগ দিতে যাবেন। সে উৎসবে নানান্ দেশ থেকে বহু রাজা আসবে। সুতরাং সেই উৎসবে যদি ওই কাপড় পরে যাওয়া যায় তবে সকলেই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকবে।

ঠিক আছে, তোমরা ওই ভালো কাপড়ই তৈরি কর। তবে কিন্তু দু' মাসের মধ্যেই শেষ হওয়া চাই। নয়তো আমি তোমাদের গর্দান নেব। রাজা বললেন।

মাথা ঝুঁকিয়ে জোচ্চোর দুটি রাজার কথা মেনে নিল।

রাজা তখুনি মন্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিলেন যে ওদের যখন যা দরকার হবে তা যেন তখুনি ওদের দেওয়া হয়।

জোচ্চোর দুটি মহা খুশি হয়ে সোনার সুতো দিয়ে কাপড় বুনবার জন্যে তখুনি কয়েক তাল সোনা নিয়ে গেল। তারপর তারা ঘরে একটা তাঁত বসাল। আর যখনই কেউ কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে আসত তখনই ওরা খটাস্ খটাস্ করে তাঁতটাকে মিছিমিছি চালাত।

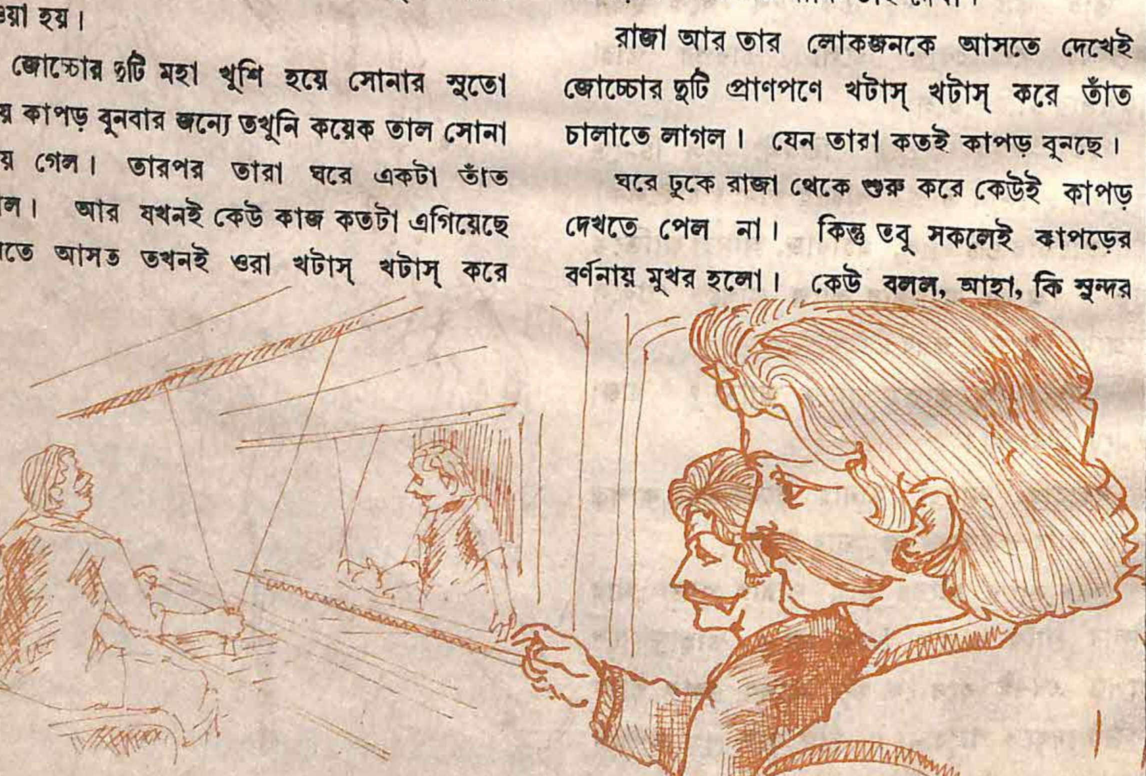
এদিকে জোচ্চোররা তো আগেই বলে দিয়েছিল যে উঁচু বংশের লোক ছাড়া কেউই কাপড় দেখতে পাবে না। সুতরাং যদিও কেউই কিছুই দেখতে পেত না তবুও অন্যের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে সে কথা তারা বলত না।

সেই সুযোগে প্রতি সপ্তাহেই জোচ্চোররা রাজদরবার থেকে সোনা, হীরে, মুক্তো, পান্না প্রভৃতি নিয়ে আসত। তারপর সেগুলো অন্য দেশের দোকানে বিক্রি করে দিত।

দু মাস পুরো হতে সাতদিন বাকি থাকতে রাজামশাই ওই জোচ্চোর দুটির বাড়িতে এলো। সঙ্গে এলেন তার পারিষদবর্গ। সকলেরই উদ্দেশ্য কাপড়টা আর কত বাকি তাই দেখা।

রাজা আর তার লোকজনকে আসতে দেখেই জোচ্চোর দুটি প্রাণপণে খটাস্ খটাস্ করে তাঁত চালাতে লাগল। যেন তারা কতই কাপড় বুনছে।

ঘরে ঢুকে রাজা থেকে শুরু করে কেউই কাপড় দেখতে পেল না। কিন্তু তবু সকলেই কাপড়ের বর্ণনায় মুখর হলো। কেউ বলল, আহা, কি সুন্দর



ফুলগুলো! কেউ বা বলল, আর পাখিগুলো দেখ, ঠিক যেন উড়ছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল যে এমন কাপড় তারা কেউই দেখেনি।

রাজা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সকলেই যখন দেখতে পাচ্ছে আর সুন্দরও হচ্ছে তখন তাকেও স্বীকার করতে হলো যে কাপড়টা সত্যিই সুন্দর।

তারপর সেই উৎসবের দিন রাজা আবার জোচ্চোর দুটির বাড়িতে এলো। জোচ্চোর দুটি নানা রকম কসরৎ করে রাজাকে মিছিমিছি কাপড় পরিয়ে দিল।

রাজার সঙ্গে যারা যারা এসেছিল তারা সকলেই হৈ হৈ করে কাপড়ের প্রশংসা করতে লাগল।

তারপর রাজা সেই মিছিমিছি কাপড় পরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে চলল হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সেপাই-শাস্ত্রী।

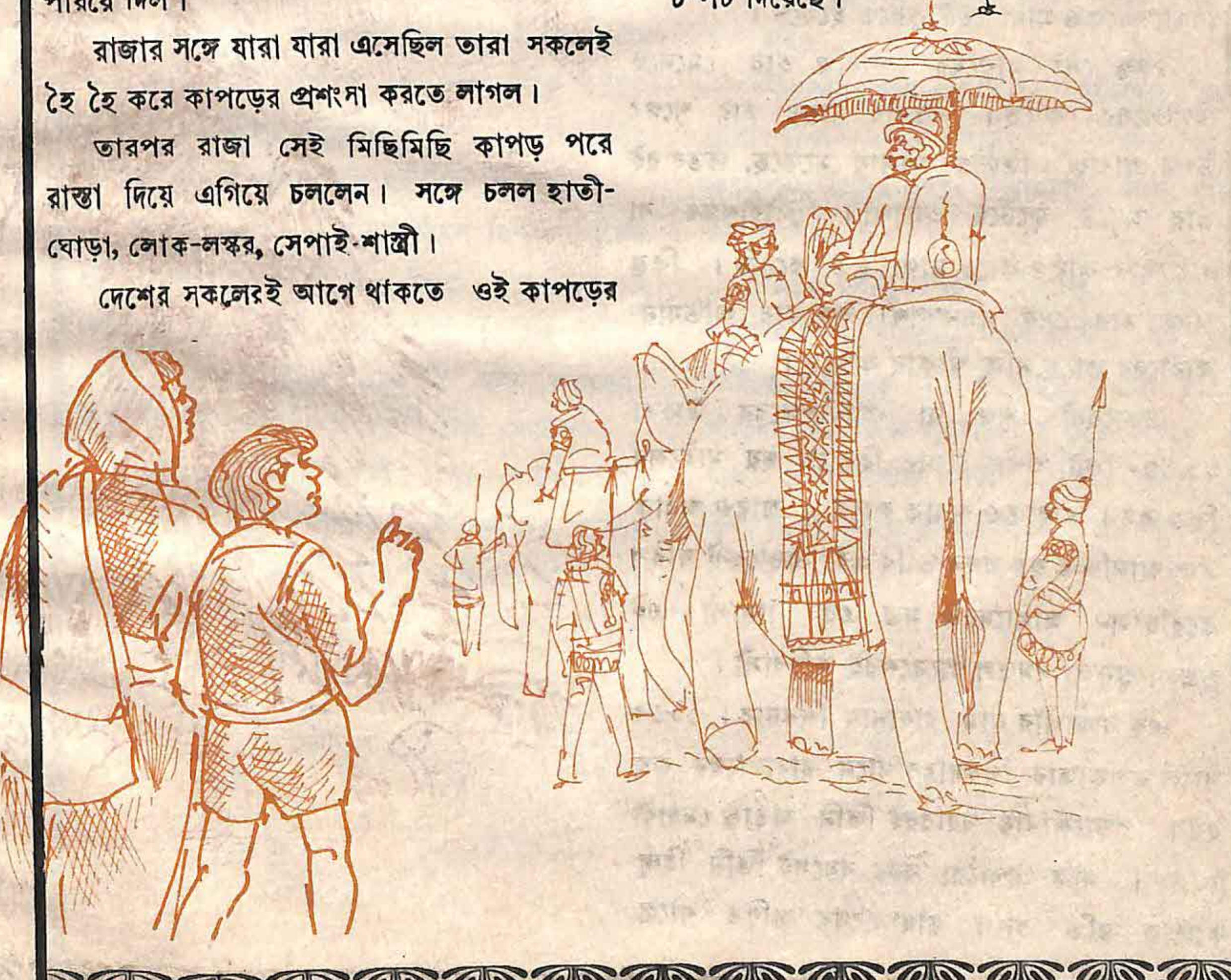
দেশের সকলেরই আগে থাকতে ওই কাপড়ের কথা শোনা ছিল। তাই রাস্তায় সকলেই কাপড়ের প্রশংসা করতে লাগল।

হঠাৎ রাস্তার মাঝে একটি ছেলে চিৎকার করে মাকে জিজ্ঞাসা করল, মা মা, রাজা কোন কাপড় পরেনি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জানতে পারল যে তারা কি ভীষণ বোকা। রাজাও বুঝতে পারল যে জোচ্চোর দুটো তাকে কেমন ঠকিয়েছে।

রাজার হুকুমে তখনই মন্ত্রী সেপাই-শাস্ত্রী নিয়ে জোচ্চোর দুটির বাড়ি ছুটল।

কিন্তু তারা তখন কোথায়? তারা আগেই চম্পট দিয়েছে।



অভিযানের গল্প

এভারেষ্ট জরিপ

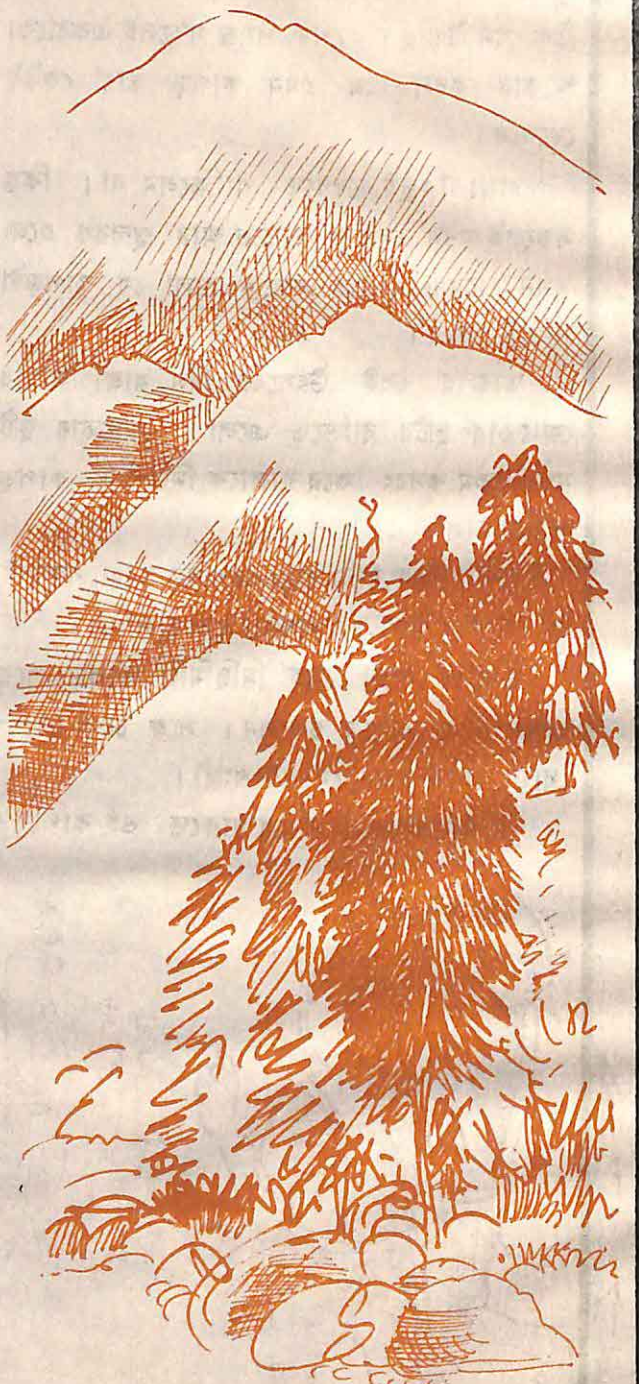
গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি—হিমালয়ের এই তিনটি শৃঙ্গ সবচেয়ে উঁচু—

মানুষের বড় হওয়ার সাধের সীমা নেই। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছায় সে মেরু ও মরুকে দু'পায়ে মাড়িয়েছে। তার অভিযানের কাছে বিন্ধ্যাচলকেও মাথা হেঁট করতে হয়েছে।

কিন্তু সেই মানুষের স্পর্ধাও হার মেনেছে হিমালয়ের কাছে। যতবার মানুষ তার শৃঙ্গের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশায় মেতেছে, ততবারই তার অদৃষ্টে জুটেছে হতাশা। গৌরীশঙ্কর বা এভারেস্ট কারও কাছে মাথা নত করেনি। কিন্তু আজ তার সেই গগনস্পর্শী অহংকার অভিযান-কারীদের কাছে নতি স্বীকার করেছে।

এভারেস্ট শৃঙ্গ বা গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৯,১৪০ ফিট, অর্থাৎ পথের হিসাবে ছয় মাইলের কিছু কম। ভাবতেও অবাক লাগে। আরও অবাক এবং আনন্দিত হই যখন ভাবি এই এভারেস্ট জরিপ করেছিলেন আমাদেরই মত এক বাঙালী—এই সুজলা সুফলা সমতল প্রদেশেরই অধিবাসী।

এই বাঙালীর নাম রাধানাথ শিকদার। ১৮১৩ সালে কলকাতার শিকদারবাগানে রাধানাথের জন্ম হয়। পড়াশোনায় বরাবরই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাত্র এগারো বছর বয়সেই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। রাধানাথের গণিত শাস্ত্রে



আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণিতের চর্চায় তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। শোনা যায় বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিউটনের বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' নামক পুস্তক পড়েন।

যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ডিরোজিও। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই তেজস্বী শিক্ষকের প্রভাব যে কত ব্যাপক ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। তৎকালীন বাংলার বহু সুসন্তানই ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রাচীন সংস্কারাদি ত্যাগ করে একটি 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁরা হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে আচারে, ব্যবহারে পুরোপুরি সাহেব হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। রাধানাথও এই দলে ছিলেন।

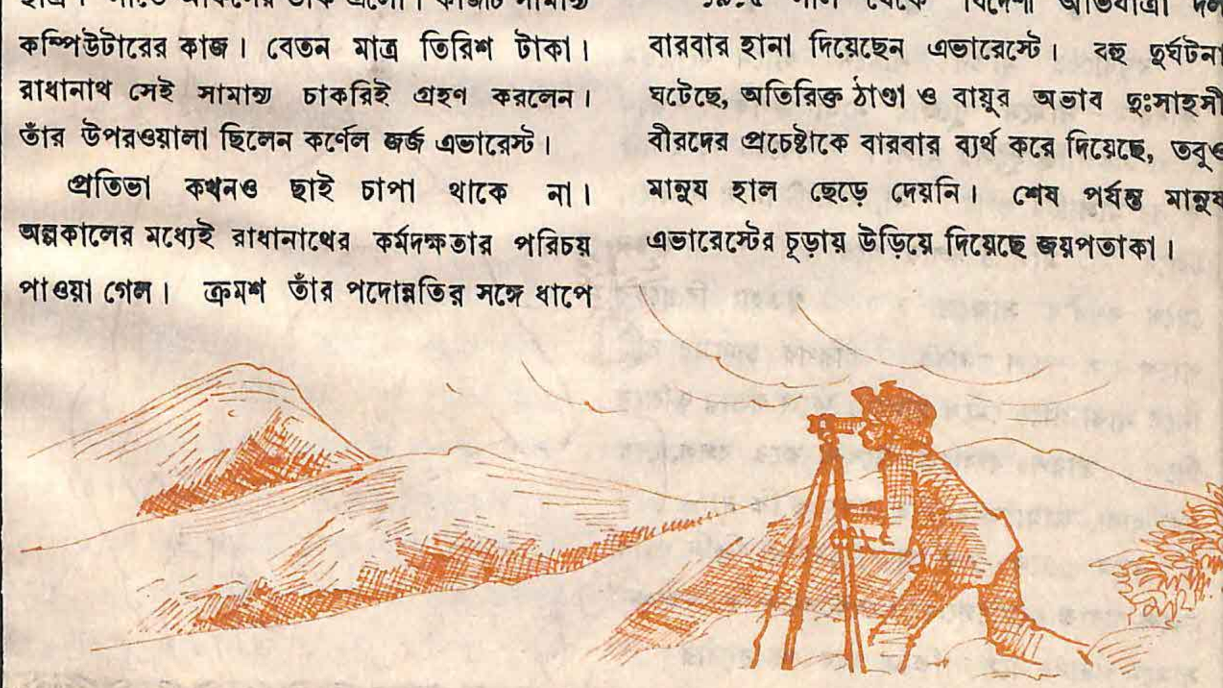
১৮৩২ সাল। রাধানাথ তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। সার্ভে অফিসের ডাক এলো। কাজটি সামান্য কম্পিউটারের কাজ। বেতন মাত্র তিরিশ টাকা। রাধানাথ সেই সামান্য চাকরিই গ্রহণ করলেন। তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন কর্ণেল জর্জ এভারেস্ট।

প্রতিভা কখনও ছাই চাপা থাকে না। অল্পকালের মধ্যেই রাধানাথের কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্রমশ তাঁর পদোন্নতির সঙ্গে ধাপে ধাপে বেতনও বাড়তে লাগল। এই বেতনই পরে ছয়শত টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

জরিপ সংক্রান্ত অঙ্কে রাধানাথের নৈপুণ্য ছিল যেমন অসাধারণ তেমনই বিস্ময়কর। কর্ণেল থুলিয়ার জরিপ সংক্রান্ত বইয়ের অধিকাংশ গণনাই রাধানাথ করে ছিলেন। কিন্তু রাধানাথের জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এভারেস্টের উচ্চতা মাপা। তাঁর নির্ভুল গণনাতেই প্রথম ধরা পড়ে যে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,১৪০ ফিট। রাধানাথের আবিষ্কারের পরই তাঁর উপরওয়ালার নাম অনুসারে ওই শৃঙ্গের নাম 'মাউণ্ট এভারেস্ট রাখা হয়।

ভীরুতার কলঙ্ক বাঙালীর চিরকালের। যে সব দুঃসাহসী এই কলঙ্কের লজ্জা কিছু পরিমাণেও লাঘব করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাধানাথের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৫ সাল থেকে বিদেশী অভিযাত্রী দল বারবার হানা দিয়েছেন এভারেস্টে। বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও বায়ুর অভাব দুঃসাহসী বীরদের প্রচেষ্টাকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে, তবুও মানুষ হাল ছেড়ে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত মানুষ এভারেস্টের চূড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে জয়পতাকা।



ছেলেবেলায় গদাধর

লালাবাবুদের বাড়ির নাটমন্দিরে পাঠশালা, ক্ষুদিরামের পাঁচ বছরের ছেলে গদাধর পাততাড়ি বগলে এসে ঢুকল পাঠশালায়। কিন্তু ইস্কুলে পড়াশোনা তার মোটেই ভালো লাগে না। পাঠশালায় আর কতগুলো ছেলে এসে জুটেছে এটাই দারুণ মজা। প্রাণ ভরে কেবল খেলা কর। যেখানে যত বেশী প্রাণ সেখানেই তত বেশী লীলা। যদি ঐ অঙ্কটা না থাকত! তার চেয়ে দাও না স্তোত্র মুখস্ত করতে—এখনই মুখস্ত করে দেবে। কিংবা দাও না তালপাতা ভর্তি করে ঠাকুরের নাম লিখতে—এখনই তালপাতা ভর্তি করে দেবে। ঠাকুরের নাম লেখা অনেক সহজ, অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

* * *

রঘুবীরের মূর্তির সামনে ধ্যানে বসেছেন ক্ষুদিরাম—সামনে পুজোর নানা উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফুলের মালা। গদাধরের বড় লোভ ফুলের মালাটির ওপর। না, মালাটি নিয়ে পালালে চলবে না, মালাটি গলায় পরে সারা গায়ে চন্দন মেখে রঘুবীর সাজতে হবে। সুতরাং বিগ্রহের পাশে বসে পড়ল গদাধর। তারপর চন্দনের বাটি নিয়ে সারা গায়ে মেখে মালাটা তুলে গলায় ঝুলিয়ে দিলে। তারপর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখ তো বাবা, আমাকে রঘুবীর দেখাচ্ছে কি না—

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। তিনি চোখ মেলে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন—কি দেখলেন, সামনে গদাধর বসে নাকি এ আর এক রঘুবীর?





কামারপুকুরের পাইনদের অবস্থা বেশ ভালোই। শিবরাত্রির সময় তাদের বাড়িতে যাত্রা হবে। পালা—শিব-দুর্গা। কিন্তু যে শিব সাজবে তার দেখা নেই। সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় কি। সকলে তখন ধরে পড়ল অধিকারীকে, যাত্রা করতেই হবে, নয়তো সারা রাত জাগব কি করে ? অধিকারী বলল, আপনারা যদি একজন শিব যোগাড় করে দিতে পারেন, বাকিটা আমি সামলে নিতে পারব।

কে একজন বলে উঠল—গদাধরকে শিব সাজালে কেমন হয় ?

সকলে একবাক্যে সায় দিয়ে উঠল, চমৎকার হয়। ও শিবের অনেক গান জানে তাই দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর শিবের পোশাকে ওকে যা মানাবে তা বলার নয়।

সকলের পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে গেল গদাধর, তারপর শিব সেজে আসরে এসে দাঁড়াল। অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারিদিকে। আসরের মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল, কেউ বা শাঁখ বাজালো। স্বয়ং অধিকারী মশাই শিবস্তুতি শুরু করলেন।

কিন্তু ও কি, গদাধর নড়ছে না কেন, কিছু বলছে না কেন ?

না, গদাধর নড়ছে না, কিছু বলছেও না, কেবল কাঁদছে। শিব আবার কাঁদে নাকি ? কেউ কেউ ছুটে এলো গদাধরের কাছে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই। কেউ বলল, চোখে মুখে জল দাও। কেউ বলল, হাওয়া কর। আবার কেউ বা বলল, শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত্র দাও !

যাত্রা ভেঙে গেল। লোকেরা কাঁধে করে গদাধরকে বাড়ি পৌছে দিল। গদাধর তখন বাহ্যজ্ঞানহীন। তখন শিবময়।

সারারাত বাড়িতে কান্নাকাটি। গদাধরের জ্ঞান ফিরছে না। সকালে চোখ মেলল গদাধর। সে তো চোখ মেলা নয় যেন চোখ মেলল দিনমণি। তার সেই আয়ত দুটি উজ্জ্বল চোখে একবার যার চোখ পড়ে সে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। পারেনিও কোন দিন কেউ।

রূপকুমারী

এক রাজা। বিরাট তার রাজ্য। হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সেপাই-শান্ত্রীতে সব সময় সারা রাজ্য গম্ গম্ করছে।

কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। রানীর মনে শান্তি নেই। কারণ তাদের সবকিছু থাকলেও একটিও ছেলেপুলে নেই।

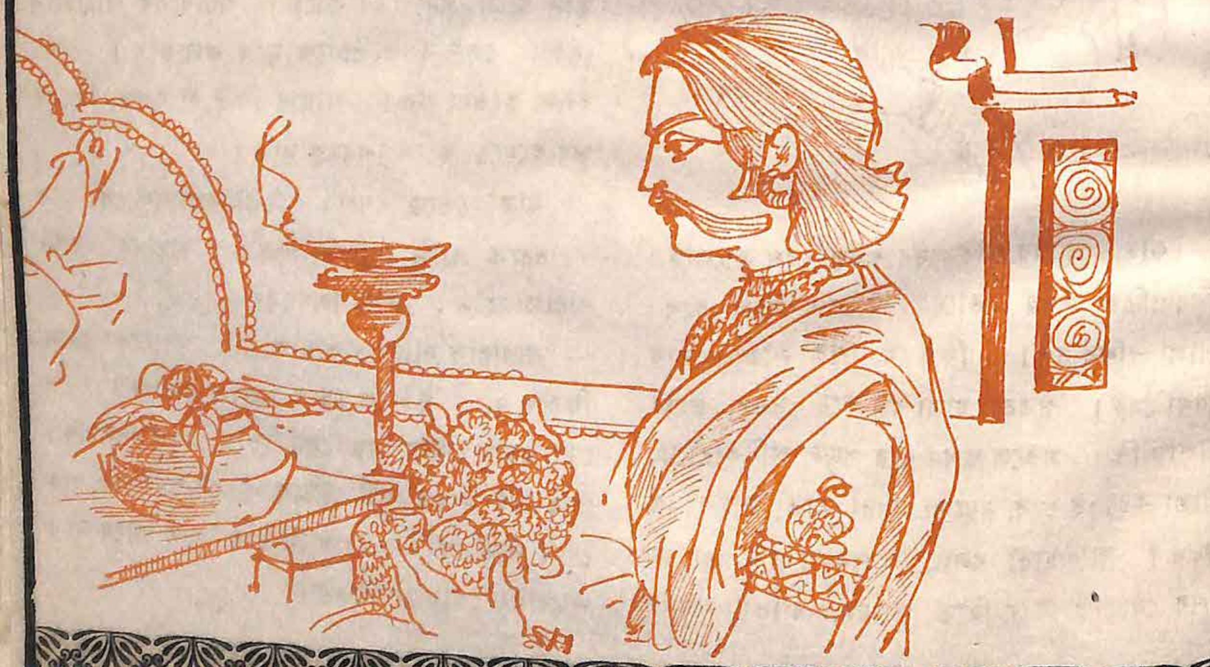
রানী দিনরাত দান-ধ্যান, পূজো-অর্চনা করেন কিন্তু কিছুই হয় না। নানা দেব-দেবীর কাছে ধর্ণা দেন, মানত করেন, তবু কোন ফলই হয় না।

অবশেষে একদিন এক সাধু এসে খড়ি পেতে হাত গুনে রাজাকে বলল, মহারাজ, দুঃখ করবেন না, শীঘ্রিই আপনার এক পরমাসুন্দরী কন্যা হবে।

সাধুর কথামতো শীঘ্রিই রাজার সত্যি সত্যি সুন্দর একটি ফুটফুটে মেয়ে হলো। সেই মেয়ের রূপে রাজপ্রাসাদ যেন আলো হয়ে গেল। তাই রাজা তার নাম রাখলেন রূপকুমারী।

তারপরে মেয়ে একটু বড় হতেই রাজা মহা ধুমধামের সঙ্গে তার অন্নপ্রাশনের আয়োজন করলেন। আর এই উপলক্ষে তিনি তার রাজ্যের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন।

সে রাজ্যে তেরোজন পরী ছিল। তার মধ্যে বারোজন রাজার বাগানেই থাকত। তারা হাসি গানে রাজার বাগান ভরিয়ে রাখত। তাই রাজা তাদের সকলকেই চিনতেন। বাকি যে জন সে খুব দুষ্টু ছিল। আর সে সর্বদাই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত বলে রাজা তাকে চিনতেন না। তাই রাজা ওই বারোজনকে নিমন্ত্রণ করলেও তেরো নম্বরকে নিমন্ত্রণ করতে পারলেন না।



অন্নপ্রাশনের দিন সকলে নিমন্ত্রণ খেয়ে চলে যাওয়ার পর ওই পরীরা এলো। বারোজন পরীর মধ্যে এগারোজন রূপকুমারীকে নানা রকম আশীর্বাদ করল। তারপর যখন আর মাত্র একজন আশীর্বাদ করতে বাকি তখন সেই দুষ্টু পরীটা এলো।

সে প্রথমেই তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলে রাজাকে গালমন্দ করল। তারপর রূপকুমারীকে অভিশাপ দিল—তুই পনেরো বছর বয়সে হাতে ছুঁচ বিঁধে মারা যাবি।

রাজা রানী অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু কিছুতেই দুষ্টু পরীর মন ভিজল না, সে রাগ করে চলে গেল।

তখন যে পরীটার আশীর্বাদ করা বাকি ছিল সে বলল, মহারাজ, আপনি দুঃখ করবেন না। আমি আশীর্বাদ করছি—ছুঁচ বিঁধে রূপকুমারীর মৃত্যু হবে না। সে কেবল বিশ বছর ঘুমিয়ে থাকবে।

তখুনি রাজা মন্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিলেন যে তার রাজপ্রাসাদে যেখানে যত ছুঁচ আছে তা যেন এখুনি ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর ছুঁচ নিয়ে কেউ কোন দিন যেন রাজপ্রাসাদে ঢুকতে না পায়।

মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাজার হুকুম পালন করলেন।

এরপর এক-দুই তিন-চার করে রূপকুমারী পনেরোয় পা দিল।

একদিন সে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মালীর ঘরে হাজির হল। মালিনী তখন ছুঁচ দিয়ে সুন্দর একটা কাঁথা সেলাই করছিল।

কাঁথাটা দেখে রূপকুমারীর বড় ভালো লাগল। আর, এর আগে সে তো কোন দিন ছুঁচ দেখেনি তাই সে মালিনীকে বলল, বাঃ, ওটা তো বেশ মজার জিনিস। আমাকে একটু দেবে? তাহলে আমি দেখি সেলাই করতে পারি কি না—

মালিনী রূপকুমারীর আগ্রহ দেখে তার হাতে ছুঁচ তুলে দিল। আর যেই না রূপকুমারী কাঁথায় একটা ফোঁড় দিয়েছে অমনি তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে রূপকুমারী জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।



খবর পেয়ে রাজা এলেন, রানী এলেন, মন্ত্রী এলেন। দিকে দিকে লোক ছুটল। আর তাদের মুখ থেকে খবর পেয়ে নানান্ দেশ থেকে অনেক বদ্যি এলো, কবিরাজ এলো। কিন্তু কেউই রাজ-কন্যার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

তখন রাজা মনের দুঃখে সুন্দর একটি কাচের পালঙ্ক তৈরি করিয়ে তাতে রূপকুমারীকে শুইয়ে দিলেন। তারপর সেই পালঙ্কটি ওই মালীর ঘরেই রেখে দিলেন।

দিন যায়, দিন যায়—এমনি করে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। কেটে গেল উনিশটি বছর।

এই মালিনী খুব সুন্দর মালা তৈরি করতে পারত বলে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই কারণে বহু দূর দূর থেকে লোকেরা এসে তার কাছ থেকে মালা তৈরি করিয়ে নিয়ে যেত।

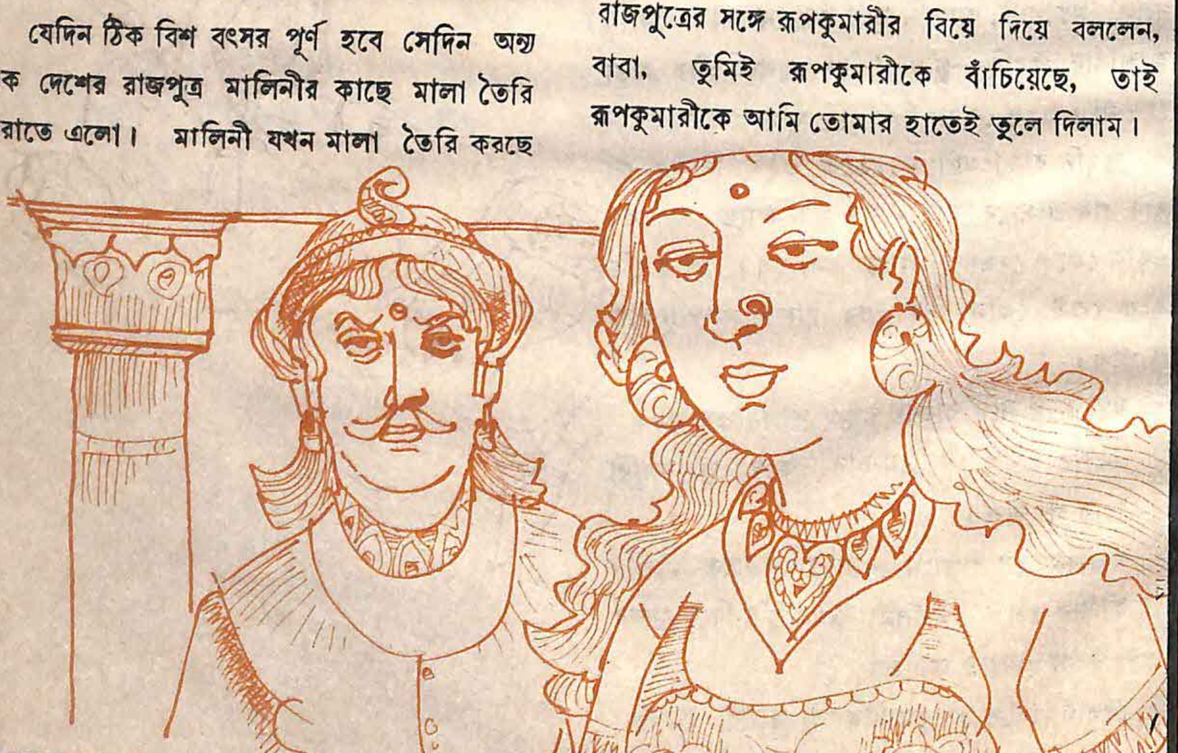
যেদিন ঠিক বিশ বৎসর পূর্ণ হবে সেদিন অন্য এক দেশের রাজপুত্র মালিনীর কাছে মালা তৈরি করাতে এলো। মালিনী যখন মালা তৈরি করছে তখন এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে রাজকুমার পালঙ্কে রূপকুমারীকে দেখতে পেল।

রূপকুমারীকে দেখে রাজপুত্রের বড় ভালো লেগে গেল। আর মালিনীকে জিজ্ঞাসা করে সে রূপকুমারীর সব কথা জানতে পারল। রাজপুত্র তখন মালিনীকে সঙ্গে করে রূপকুমারীর পালঙ্কের কাছে এলো। তারপর দেখি তো কি হয়েছে—এই বলে যেই না রূপকুমারীর আঙুল থেকে ছুঁচটা বের করেছে অমনি রূপকুমারী আস্তে আস্তে চোখ মেলে উঠে বসল।

রাজা রানী এ খবর পেয়ে মালিনীর ঘরে ছুটে এলেন। তারপর রূপকুমারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুললেন।

সারা রাজ্যের লোক উৎসবে মেতে উঠল।

তারপর একটা শুভদিন দেখে রাজা ওই রাজপুত্রের সঙ্গে রূপকুমারীর বিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা, তুমিই রূপকুমারীকে বাঁচিয়েছ, তাই রূপকুমারীকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম।



মহাপুরুষের জীবন কথা

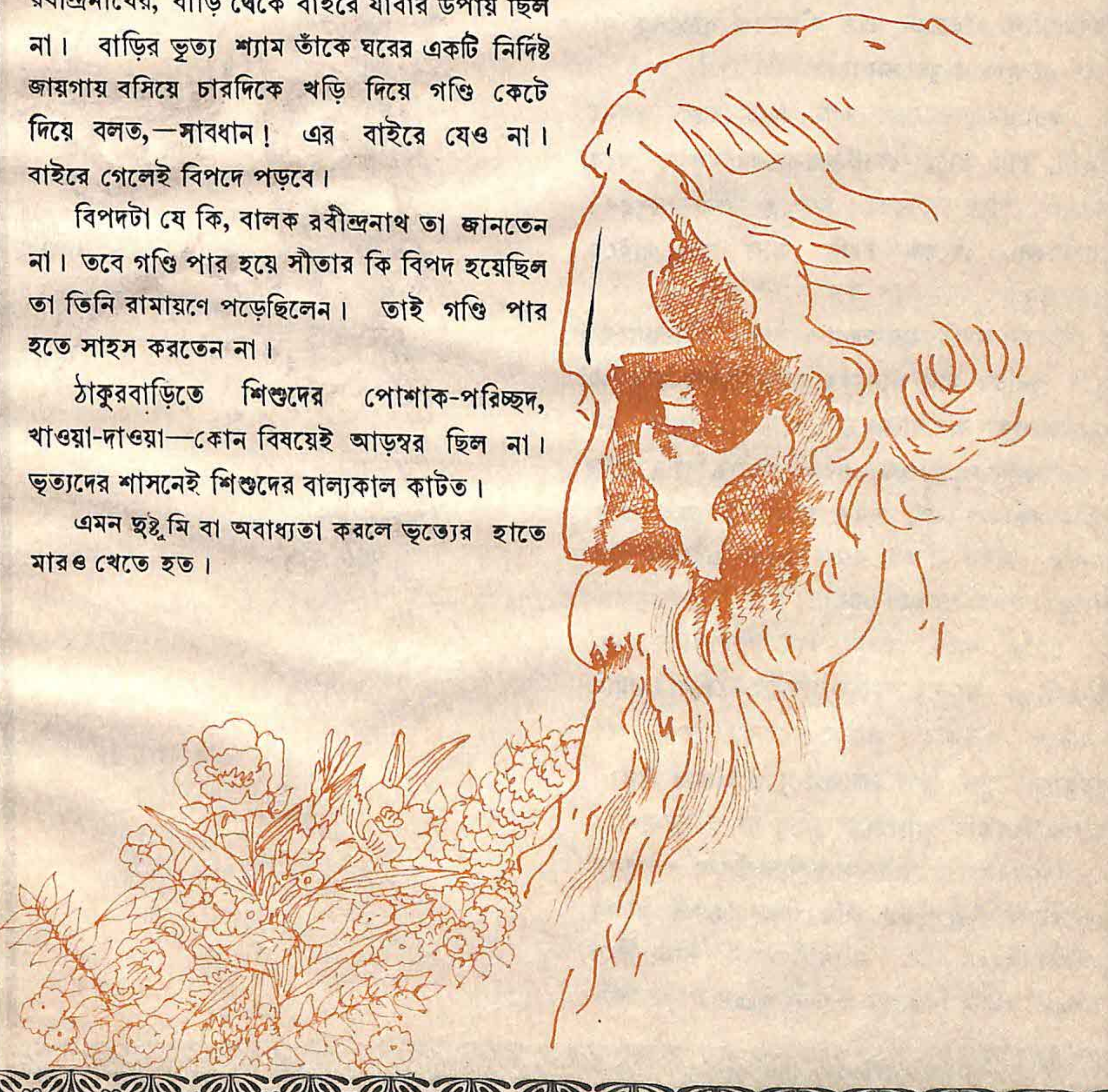
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ছোটবেলায় কঠিন শাসনের মধ্যে দিন কাটত রবীন্দ্রনাথের, বাড়ি থেকে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। বাড়ির ভৃত্য শ্যাম তাঁকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে চারদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে দিয়ে বলত,—সাবধান! এর বাইরে যেও না। বাইরে গেলেই বিপদে পড়বে।

বিপদটা যে কি, বালক রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন না। তবে গণ্ডি পার হয়ে সীতার কি বিপদ হয়েছিল তা তিনি রামায়ণে পড়েছিলেন। তাই গণ্ডি পার হতে সাহস করতেন না।

ঠাকুরবাড়িতে শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া—কোন বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। ভৃত্যদের শাসনেই শিশুদের বাল্যকাল কাটত।

এমন দুষ্টুমি বা অবাধ্যতা করলে ভৃত্যের হাতে মারও খেতে হত।



ভৃত্যের হাতে মার খেয়ে চোখের জল ফেলবারও উপায় ছিল না। তখনকার দিনে রান্নাঘরে বড় বড় মাটির জালায় পানীয় জল রাখা হত। কাঁদলেই ভৃত্যরা তাকে ওই জালার কাছে নিয়ে গিয়ে বলত—যদি কাঁদো, তাহলে জালার ভেতর পুরে মুখ বন্ধ করে দেব। এ রকম ভয় দেখানোর ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রহারের ভয়ে কাঁদতেও পারতেন না, দুঃখ ভুলে চোখ মুছতেন।

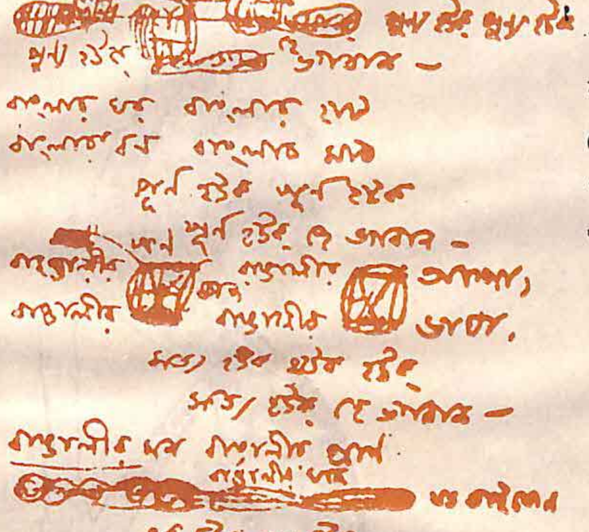
রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন আট বছর, তখনই তিনি তার ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের মুখে স্বরচিত গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এ দেশের রাজা যদি বাংলা ভাষা জানত, তাহলে এই তরুণ কবিকে পুরস্কৃত করত। কিন্তু তার যখন কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আমাকেই সেই কাজ করতে হবে। এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেন।

১৯১৩ সালে তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। তখন এই পুরস্কারের মূল্য ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এরপর 'বিশ্বকবি' খ্যাতিতে ভূষিত হন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তাঁর পিতা বোলপুর ভুবনডাঙায় বিশ বিঘা জমি কিনে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তিনিকেতন নাম দিয়ে সেখানে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী-







কালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই শান্তিনিকেতন 'বিশ্বভারতী' নামে বিশ্বের সকল দেশের মানুষের মিলনতীর্থে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে তখন দেশপ্রেমের বন্যা—দেশের মুক্তির জন্যে শুরু হয়েছে আন্দোলন। বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙালীর ঐক্য ভেঙে দেবার জন্যে বাংলা দেশকে ভাগ করলেন। তার প্রতিবাদে শুরু হল সারা দেশময় আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে এগিয়ে এসে গান রচনা করলেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান।"

তারপর খালি পায়ে পথে পথে ঘুরে সেই গান গেয়ে তিনি-হিন্দু-মুসলমান সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে দেশপ্রেম ছিল ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত। ইংরেজ সরকার যখন পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার অসহায় নরনারীকে গুলি করে হত্যা করল, তখন তিনি ইংরেজের দেওয়া 'স্যার' উপাধি ফিরিয়ে দিলেন।

ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখলেন—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা,
তুমি কি বেসেছ ভালো?"

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি ভালোবাসতেন সারা বিশ্বের মানুষকে।

মহাপুরুষের জীবন কথা

নেতাজী সুভাষ



ভারতে কত নেতাই তো জন্মেছেন। কিন্তু 'নেতাজী' বলতে একটিমাত্র মানুষকেই বোঝায়-- তিনি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করতেন। আর তাঁর মায়ের নাম ছিল প্রভাবতী দেবী।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। ১৯১৩ সালে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্র অবস্থাতেই দেশের প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক ভারতবাসীর নিন্দা করলে সুভাষচন্দ্র তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে সসম্মানে আই. সি. এস. পরীক্ষা পাস করে দেশে ফেরেন। ঐ সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে চলছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। তাই তিনি ইংরেজের অধীনে মোটা মাইনের চাকরি হেলায় ত্যাগ করে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কর্মী ও সংগঠক হিসাবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। এরপর তাঁকে যে কতবার জেলে যেতে হয়েছে, কত অত্যাচার সহ্য



করতে হয়েছে, তার ঠিকানা নেই। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে পর পর দু' বছর তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯৪০ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দী করে তাঁর নিজের বাড়িতে আটকে রাখে। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল—ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিল জার্মানী ও জাপানের। তিনি ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে নজরবন্দী থাকাকালীন ছদ্মবেশে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা পুলিসের কড়া পাহারা এড়িয়ে ভারত ত্যাগ করে কাবুল যান।

সেখান থেকে প্রথমে মস্কো তারপর বার্লিন যান। পরে বার্লিন থেকে সাবমেরিনে করে সিঙ্গাপুর যান। সেই সময়ে ভারতের আর একজন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ঐ অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার পরিকল্পনা করছিলেন। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছলে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব তিনি সুভাষ-চন্দ্রের হাতে তুলে দেন।

তখন থেকে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে পরিচিত হন। তিনি দুর্ধর্ষ 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার জন্য মণিপুরে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি প্রথম স্বাধীন ভারতের বিজয় পতাকা ওড়ান।

কিন্তু এই সময় যুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের পরাজয় ঘটতে থাকে। হঠাৎ প্রচারিত হয় যে, ফরমোজার (বর্তমান তাইওয়ান) তাইহোকু বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। সত্যই এইভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কিনা, তা আজও জানা যায়নি। তিনি মৃত কি জীবিত তা না জানা গেলেও তিনি প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে অমর হয়ে আছেন।

আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে ২৩শে জানুয়ারি নেতাজীর পবিত্র জন্মক্ষণ স্মরণ করে শঙ্খধ্বনি হয়। এদেশে এমন আর কারো জন্মক্ষণের স্মরণে উৎসব হয় না।

বীরবলের গল্প

জ্ঞানভাণ্ডার



যমুনা নদীর তীরে শাহানশা আকবরের একটি সুদৃশ্য ও মনোরম প্রমোদাগার ছিল। খাস দিল্লীর বাদশার প্রমোদাগার সুতরাং তার ঠাট-বাট জাঁক-জমক যে কি রকম তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলবার দরকার নেই। রাজ্য শাসন করতে করতে আকবর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন এই প্রমোদাগারে এসে নাচ-গান-বাজনার মধ্যে কাটিয়ে যেতেন দিন কতক। তিনি যখন আসতেন তখন তার সঙ্গে থাকত সভাসদ্‌রাও। সভাসদ কিন্তু ওই নামেই—সভার কোন রকম কথা, কাজ চলত না ওখানে। দিনরাত খালি দেদার ফুর্তি।

একবার এই প্রমোদাগারে এসে দিন ছয়েক থাকবার পর একদিন বৈকালে যমুনার তীরে বাঁধানো ঘাটে মজলিশ বসানো হয়েছে। নামী-দামী সব গাইয়েরা এসেছেন। গান-বাজনা চলছে। এমন সময় আকবর হঠাৎ এমনই এক কাজ করে বসলেন যার কোন অর্থ ই হয় না—আর, তার পরই লজ্জায় আকবরের মাথা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করল।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি আকবর গানের মাঝে আতরদান থেকে সভায় আতর ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আতর দিতে দিতে আতরদানের আতর ফুরিয়ে যাওয়ায় আকবর আতরদানে আতর ঢালতে গেলেন। অথচ এই ঢালাঢালির ব্যাপারটা তার করার দরকার ছিল না—যে কোন বান্দা বা বান্দীকে হুকুম দিলেই হতো। তা না করে তিনি



নিজেই কাজটা করতে গিয়ে ঝামেলা পাকালেন।

কিছুটা আতর মখমলের ওপর পড়ে গেল। আর এমনই দুর্গ্রহ, যিনি নাকি আতর ছড়াচ্ছেন সেই তিনিই মখমলের ওপর থেকে ওই আতর তুলতে গেলেন। কিন্তু তা তিনি পারবেন কেন—আতর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তো তা মখমল শুষে নিয়েছে। তাই তুলতে গিয়েই বাদশার খেয়াল হলো—কাজটা বোকার মতো হয়ে গিয়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকালেন—এই বোকামি কেউ লক্ষ্য করেছে কি না। না, করেনি—সকলেই ওস্তাদজীর গানে বিভোর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আকবর তাকালেন পিছন দিকে—অমনি বীরবলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তাঁর। ইস, ছি ছি ছি! কি লজ্জা, কি লজ্জা! বীরবল দেখে ফেলেছে!

মনে মনে জিভ কাটলেন আকবর—আর সেই যে তিনি মাথা হেঁট করে বসলেন সে মাথা আর তুলতে পারলেন না। না না, বীরবলের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মরমে মরে যাবেন তিনি। শুধু তাই না, মজলিশ যখন প্রায় শেষের মুখে, পাছে বীরবল কিছু বলে বসে, তাই তিনি আগে ভাগেই উঠে গেলেন।

পরদিন আকবর বাদশা স্থানীয় লোকদের দ্বিপ্রাহরিক আহারে নিমন্ত্রণ করলেন। তারপর তারা এলে তিনি স্বহস্তে তাদের প্রায় আতর দিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন। যেন বীরবলকে দেখাতে চাইলেন—দেখ বীরবল, তুমি ভুল দেখেছ। দু-চার ফোঁটা তো দূরের কথা ভরি ভরি আতর আমি এমনি ভাবে নষ্ট করতে পারি।

বীরবল কোন দিনই আকবরকে ছেড়ে কথা

বলেননি—তাই এবারও ছাড়লেন না। গুটি গুটি পায়ে আকবরের কাছে এগিয়ে এসে চুপি চুপি বললেন, জাঁহাপনা, যতই আতর বিলান না কেন, কালকের আতর কিন্তু ফিরে পাবেন না—



বীরবলের মন্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হলেন আকবর, আর আকবরের যা নীতিবিরুদ্ধ, তাইই করলেন তিনি। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বীরবলকে প্রমোদাগার থেকে বের করে দিলেন। আর শুধু তাতেই ক্ষান্ত হলেন না, হুকুমজারি করলেন, খবরদার, তোমাকে যেন আমি আমার রাজ্যের ত্রিসীমানায় না দেখতে পাই!

বীরবল ভীষণ অপমানিত বোধ করে প্রমোদাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলেন, প্রায়ই তো এ রকম হয়, বাদশা রেগে গিয়ে তাকে বের করে দেন পরে নিজেই আবার উজির নাজিরকে পাঠিয়ে, পুরস্কার পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনান—তো এবারও সেই রকমই হবে।



কিন্তু না, এবার সে রকম হলো না। উল্টে দুদিন পর রাজসভা থেকে লোক জানতে এলো যে বীরবল বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে কিনা। না, এর পর আর থাকা চলে না। বীরবল মনের দুঃখে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে দেশান্তরী হলেন।

পর পর কয়েকদিন রাজসভায় বীরবল নেই আর স্বয়ং বাদশাও কিছুই বলছেন না—তাতে সভাসদের সকলেরই কেমন সন্দেহ হলো। তার পর কানাঘুষোয় খবরটা জানতে আর বাকি রইল না কারও—বাদশা বীরবলকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বীরবলকে যারা একেবারেই সহ্য করতে পারত না তারা আনন্দে নেচে উঠল। আর বীরবল সব সময় তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে বাদশাকে সাহায্য



করার ফলে যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারছিল না, তারা বাদশাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলল। বাদশা হাড়ে-হাড়ে টের পেতে থাকলেন—বীরবল থাকার ফলে তিনি কত দিক থেকে কত ভাবে মুক্ত ছিলেন। কি ভুল করেছেন তিনি রাগের মাথায় বীরবলকে তাড়িয়ে দিয়ে।

ক্রমে এই খবর রটতে রটতে তুরস্কের বাদশার কানে গিয়ে পৌঁছাল। তিনি ভাবলেন—এই সুযোগ। বীরবল নেই, এবার আকবরকে একটু হেনস্থা করা যাক। তিনি সেই দিনই দূত পাঠালেন দিল্লীর দরবারে। জানিয়ে দিলেন—তার একটি জ্ঞানভাণ্ডার প্রয়োজন। মাস খানেকের মধ্যেই তাকে যদি সেই জ্ঞানভাণ্ডার পাঠিয়ে দেওয়া না হয় তবে তিনি দিল্লী আক্রমণ করবেন।

মহা সমস্যায় পড়লেন আকবর—এ কি ফ্যাসাদ! জ্ঞানভাণ্ডার দেখা তো দূরের কথা, এমন নামও তিনি শোনেননি কোন দিন—তাহলে সে জিনিস তিনি পাঠাবেন কোত্থেকে! ইস, এই সময় যদি বীরবল থাকতো—ভাবলেন আকবর—এই সমস্ত উদ্ভট উদ্ভট বিপদ থেকে সে-ই আমাকে বারবার বাঁচিয়েছে। নাঃ, আর মান সম্মানের কথা ভাবলে চলবে না—তুরস্কের বাদশা দিল্লী আক্রমণ করলে তো আর রক্ষে নেই—কত ধন, সম্পত্তি যে নষ্ট হবে আর কত লোকের যে প্রাণ যাবে তার ইয়ত্তা নেই। না না, বীরবলকে ফিরিয়ে আনো, বীরবলকে চাই—

দিকে দিকে বাদশাহী ফরমান নিয়ে চর ছুটল—বীরবলকে চাই—বীরবলকে চাই—

অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে বীরবলকে পাওয়া গেল মালওয়া প্রদেশে। আর অনেক

কাকুতি-মিনতি করে ফিরিয়ে আনা হলো তাকে দিল্লী দরবারে।

বীরবল ফিরে এলেই আকবর জড়িয়ে ধরলেন তাকে—যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। বললেন, আরে, আমি চলে যেতে বলেছি বলেই চলে গেলে! এর আগে তো আরও কতবার এই রকম ঘটেছে, তাহলে এবার নিরুদ্দেশ হলে কেন?

বীরবল আর কি জবাব দেবেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যাক গে যাক, শোন—বলে আকবর তাঁর এবারের মহা সমস্যার কথা জানালেন, জানালেন তুরস্কের বাদশার জ্ঞানভাণ্ডার চেয়ে পাঠানো আর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের হুমকির কথা—

বীরবল বাদশার সমস্যা শুনে বলে উঠলেন, এই কথা—ও আপনি ভাববেন না জাঁহাপনা, আমি সব ঠিক করে দেব—

বললেন বটে বীরবল, কিন্তু কি করা যায় কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না কয়েক দিন। অবশেষে মাথায় বুদ্ধি এলো তার। তিনি সুন্দর কারুকাজ করা একটা পাথরের কলসী নিয়ে হাজির হলেন বাদশার সব্জীচাষের বাগানে। ওঃ, দিকে দিকে কত কি-ই না ফলে আছে। আর হবে না-ই-বা কেন, স্বয়ং বাদশার তদ্বিরে চাষ হয়, হতেই হবে।

বীরবল করলেন কি কুমড়ো গাছের কাছে গিয়ে ওই কলসীর মধ্যে ঢোকে এমন একটা জালি কুমড়ো কলসীর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে এলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই কুমড়োটি বড় হয়ে কলসীর মধ্যে জবরদস্ত আটকে গেল। তখন বীরবল করলেন কি বোঁটা কেটে কুমড়ো সমেত কলসীটি হাজির করলেন আকবরের কাছে। বললেন, এইটি তুরস্কের বাদশার



কাছে পাঠিয়ে দিন জাঁহাপনা। বলে দেবেন—এটাই জ্ঞানভাণ্ডার। কুমড়োটি বের করে নিলেই জ্ঞানভাণ্ডার চোখে পড়বে। তবে সাবধান, কুমড়ো অথবা কলসীটি যেন কখনই না ভাঙে—ভাঙলেই যুদ্ধ।

আকবর যথা সময়ের সেই কুমড়ো ভরা কলসী কিংবা কলসী ভরা কুমড়ো তুরস্কের বাদশার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তুরস্কের বাদশা এটি পেয়েই চমৎকৃত হলেন। কার বুদ্ধিতে যে এটি ঘটেছে সেটা বুঝে নিতে তার দেরী হলো না। তিনি বুঝলেন—বীরবল আবার বাদশার কাছে ফিরে এসেছে—সুতরাং বেচাল করলেই মুশকিল হবে।

গল্প বিচিত্রা

